খণ্ড ১০, সংখ্যা ১১ ভাবনগর জুন ২০১৯
Vol. 10, No. 11 BHĀBANAGARA June 2019

“পিরিত কাণ্টার মালা”
রঙ্গমালা সুন্দরী বা চৌধুরীর লড়াই শীর্ষক গীতিকাতে চরিত্র ও সামাজিক ইতিহাস

ডেভিড এল. কার্লী

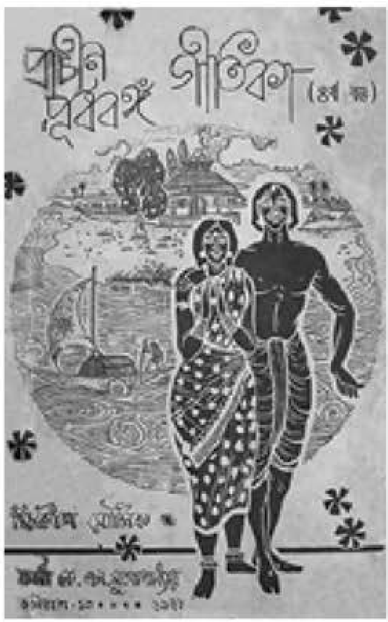

ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকার প্রচ্ছদ

Love is a Garland of Thorn
Character and social history of the Ballad of *Rangamala Sundhuri or Chowdhurir Larhai*

David L. Curley

Abstract

This article is based on the revolt of Nawabs and Zamindars of East Bengal against English Company during 1761-1763. David L. Curley, the writer of this article, used documents, records, and letters of English Company as historical evidence. But from these, he gave priority on the Ballad of *Rangamala Sundhuri or Chowdhurir Larhai.* According to the writer of this article, a reader of this Ballad could easily get acquainted with the social atmosphere of that revolt. Especially one can investigate the acceptable limits of the marriage of Zamindar-family and their power of infringing those. Besides, one can gather information on the revolt of Zamindar from this Ballad. Indeed, these two things are mixed in it. The researcher used documents and letters of English Company as well as Purbabanga Gitika and Prachin Purbabanga Gitika which were compiled and edited by Dineshchandra Sen and Khitishchandra Moulik respectively.

এই প্রবন্ধের বিষয়[1] ১৭৬১-১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানি বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের নবাব ও কয়েকজন জমিদারের বিদ্রোহ। ঐতিহাসিক আকর স্বরূপ আমি ইংরেজ কোম্পানির নথি, দলিল ও চিঠি-পত্র ব্যবহার করেছি। কিন্তু তার চেয়েও বেশি পূর্ববঙ্গের একটা গীতিকা *রঙ্গমালা সুন্দরী বা চৌধুরীর লড়াই*-এর উপরে নির্ভর করেছি। আমার বিশ্বাস, গীতিকাটির ভেতর দিয়ে বিদ্রোহের সামাজিক পরিবেশের বিবরণ লাভ করা যায়। বিশেষত জমিদারি-বংশের বৈবাহিক সম্বন্ধের যে প্রচলিত সীমা ছিল ও জমিদারদের তা লঙ্ঘন করার যে ক্ষমতা ছিল, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা সম্ভব। এছাড়া, জমিদার বিদ্রোহ সম্পর্কে গীতিকাটির ভেতর দিয়ে তথ্য পাওয়া যায়। আসলে, দুটো বিষয়ই গীতিকাটিতে মেলামেশা করে আছে।

দুজন অভিজ্ঞ বাঙালি গবেষক অনেক পরিশ্রম করে পূর্ববঙ্গের গীতিকার সংকলন ও সম্পাদনা করেছিলেন। যার মধ্যে প্রথমজন ছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন এবং দ্বিতীয়জন ছিলেন ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক।[২] অবশ্য পরের জন প্রথমজনের নিদর্শন অনুসরণ করেই তাঁর পাঠ সংকলন ও সম্পাদনা করেছিলেন। উল্লেখ করতে দ্বিধা নেই যে, তাঁদের দু'জনের কাজ না হলে আমি এই বিষয়ে কিছু করতে পারতাম না। বলা বাহুল্য, গীতিকা ইতিহাসের দলিল-পত্র নয়। তাই ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে গীতিকার ব্যবহার বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করে। আমরা জানি যে, গীতিকার ক্ষেত্রে তার রচনার আচার এবং গায়েন-শ্রাবক বা শ্রোতাদের প্রত্যাশা (expectations) বুঝে নিতে হয়। সেই বিবেচনায় যাবার আগে আমরা দীনেশচন্দ্র সেন ও ক্ষিতীচন্দ্র মৌলিকের সম্পাদনা প্রসঙ্গে দু'একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি।

দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনাতে কয়েকটি দোষ-ত্রুটি আছে বলে ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক মত প্রকাশ করেন। সাম্প্রতিক কালের একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক দীপেশ চক্রবর্তী তাঁর সমালোচনাতেও একই মত পোষণ করেছেন। যখন দীনেশচন্দ্র সেন প্রকাশ হওয়ার উপযুক্ত গীতিকাগুলো বেছে নেন তখন যে যে গীতিকাতে অনেক ফারসি শব্দ, বা শৃঙ্গার রসের আধিক্য, বা উচ্চশ্রেণির লোকদের প্রতি বেশি বিদ্রুপ আছে তা বাদ দিতেন।[৩] সে বাছাই-প্রণালির কারণ তাঁর নিজের ঝোঁক ও পক্ষপাত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক তাঁর পূর্বজন গবেষক-সম্পাদক দীনেশচন্দ্র

সেনের বাছাইকৃত গীতিকার কোন সমালোচনা বা সংশোধন করেন নি। তিনি সেনের সম্পাদনাতে যে যে পাঠের ত্রুটি আবিস্কার করেন, মৌলিক তা মোচন করেন ভিন্নভাবে। তাঁর মতে মূলগল্পের ভেতরে যে যে নতুন উপকথা এসেছিল, তা তিনি বাদ দিয়ে মূল পাঠ পুনঃস্থাপন করতে চেষ্টা করেন।

মৌলিকের সমালোচনায় উল্লিখিত হয়েছে যে, সেনের কার্যসাধনার প্রণালীর (method of working) দরুন তাঁর সম্পাদনাতে পাঠের অনেক দোষ-ত্রুটি সাধিত হয়েছে। সেন মূলত তাঁর সাহায্যকারীদের উপরে নির্ভর করেন—যাঁরা গায়েনদের গানের পদ শুনত আর যেমন বুঝত তা-ই লিখত এবং সেভাবেই গীতিকার এক একটি হস্তলিখিত নতুন পুথি তৈরি করত। কিন্তু দেশী লোক না হলে তাঁরা গায়েনদের সব শব্দ ঠিক করে বুঝতে পারত না। মৌলিক জানতে পারেন যে, কিছু গায়েন গানের পুথি নিজে লিখে রাখত—যেন গীতিকার পাঠ বা পরিবেশনে কোন বিস্মরণ না ঘটে। মৌলিক গায়েনদের লিখিত পুথি ব্যবহারের মাধ্যমে যতটা সম্ভব সেনের দোষ-ত্রুটি সংশোধন করে তাঁর নতুন পাঠ সম্পাদন করেন।[৪]

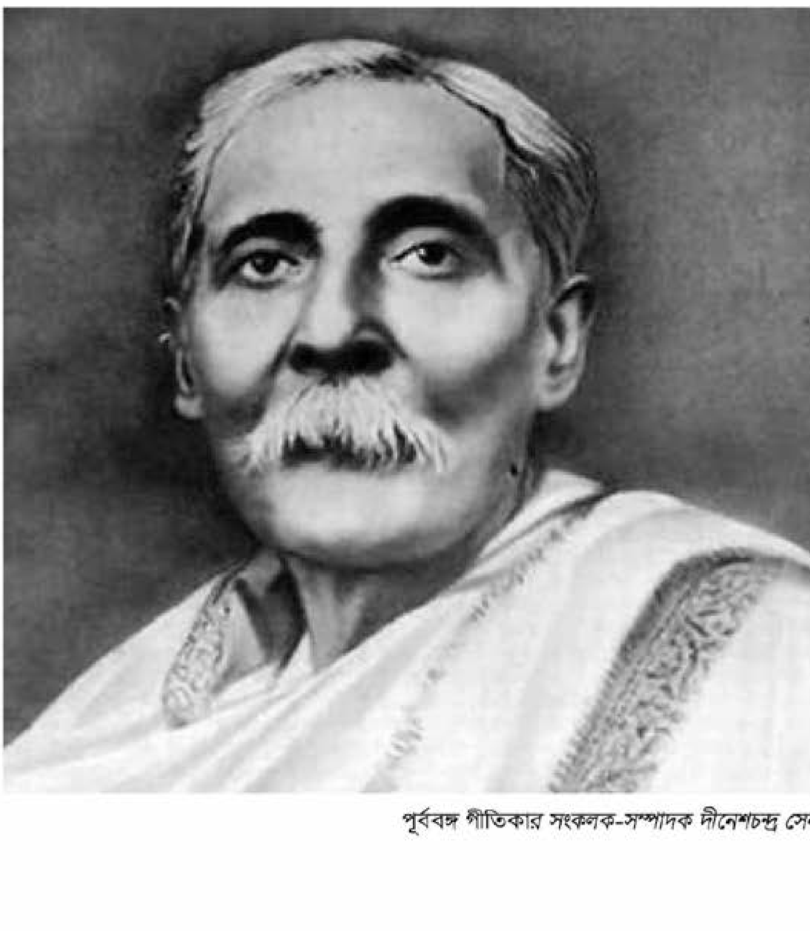

পূর্ববঙ্গ গীতিকার সংকলক-সম্পাদক দীনেশচন্দ্র সেন

জাতীয়তাবাদের মত ও ভাব অনুসারে দীনেশচন্দ্র সেনের বিশ্বাস ছিল যে, পূর্ববঙ্গের সব গীতিকা প্রাচীন, আর অনেক কাল ধরে অপরিবর্তিত অবস্থাতে গায়েনদের দ্বারা তা সংরক্ষিত হয়ে আসছে।

এই প্রবন্ধে আমরা যে গীতিকাটি বিশ্লেষণ করেছি, তার নাম—"রঙ্গমালা সুন্দরী বা চৌধুরীর লড়াই"। সেন ও মৌলিকের দুটি সম্পাদনাতে, আর বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে মুদ্রিত কয়েকটি বইয়ে তার নানা রূপ আছে। এই নানা রূপ বিশ্লেষণ করলে জানা যায় যে, কালক্রমে গীতিকাটিতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। গীতিকাটির মূলগল্পের কার্য-কারণ (causes and consequences) বিস্তৃত করতে গিয়ে গায়েন বা সম্পাদকগণ গীতিকার আখ্যানের আদি ও শেষ পর্বে নানা উপকথা সংযুক্ত করেছেন। আর মাঝে মাঝে তারা মূলগল্পও বদল করেছেন। আসলে, গায়েনদের স্মরণ ও শ্রাবকদের রস প্রত্যাশা ও জনসাধারণে প্রচলিত ঐতিহ্যের দরুন গীতিকার আখ্যান সংরক্ষিত হত, তেমনি পরিবর্তিত হত ঐতিহ্যের বিস্মরণে, বড় লোকদের প্রভাবে, আর জনসাধরণের আচার, ভাব ও স্বাদের রূপান্তরে। গীতিকা পরিবর্তন হয়েছে বলে ইতিহাস রচনায় বা ইতিহাসের প্রামাণ্য অনুসন্ধানের জন্যে তা ব্যবহার করতে গেলে তার মূলগল্পের রচনার কাল ও তার নানা উপকথার রচনার কাল নির্ণয় করার প্রয়োজন পড়ে। এক গীতিকার নানা রূপ (versions) হয় বলে আমাদের কোন রূপ পূর্ববতী আর কোনটা পরবর্তী নির্ণয় করতে হয়। সে জন্যে গীতিকার আদি ও শেষ পর্বের উপকথা ব্যাখ্যা করেছি ও তাদের গুরুত্বও বিবেচনা করেছি।

প্রেম বা রোমান্টিক গীতিকা

পূর্ববঙ্গের প্রেম-গীতিকার প্রণালীতে দৈবাৎ নদীর ঘাটে যুবক ও যুবতীর প্রথম দেখা হয়। তাদের স্বীয় ইচ্ছায় বিবাহ স্থির করা অসম্ভব নয়। মেয়েটি যুবকটিকে আদেশ দিতে পারত—যখন আর যেভাবে সেই ঘাট থেকে তাকে অপহরণ (apparent abduction) করা যাবে। তারা এতে নিশ্চয় অনেক মুশকিলে পড়ে, আর এ ধরনের মুশকিল সৃষ্টির মাধ্যমে পূর্ববঙ্গের প্রেম-গীতিকাতে জাতি, শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

অষ্টাদশ শতকে বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন পূর্ববঙ্গের নদীর কূলের ঘাট, হাট-বাজার এবং বন্দরে আসত; আর তারা নানা জাতিতে আর বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের অঙ্গীভূত হলেও একত্রে কাজ করত। মাঝে-মাঝে বিভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায়ে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বিবাহ হত।[৫] কিন্তু একটি গীতিকাতে একজন মুসলমান ছেলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, মগ-মেয়েদের সঙ্গে বাংলার মুসলমান ছেলেদের বিবাহ অসম্ভব। কেননা, মগ মহিলাদের পর্দা নেই, শরমও নেই, আর মগ পুরুষরা রান্না করে থাকে।[৬]

দৃষ্টান্ত স্বরূপ দীনেশচন্দ্র সেনের সংকলিত-সম্পাদিত দুটো গীতিকার কাহিনী-সংক্ষেপ উল্লেখ করা যায়, যার প্রথমটি ময়মনসিংহ এবং দ্বিতীয়টি চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। প্রথম গীতিকাতে একজন ধনী বণিকের মেয়ে তার কুলের কুলীনতা লঙ্ঘন করে ইষ্ট ছেলের সঙ্গে প্রেম বিবাহ করতে স্থির করল, আর তাকে অপহরণের ফন্দি

করল। বাড়িতে গেলে ছেলের বাবা বিবাহে সম্মত হলেন না, তিনি দম্পতিকে বাড়ি থেকে খেদায়ে বের করে দিলেন। এ অবস্থায় তারা পতিত অবস্থাতে জীবন যাপন আরম্ভ করে। ছেলেটি যখন বাণিজ্য করতে নদীযাত্রায় বেরিয়ে পড়ে, তখন ছেলেটার একজন দুষ্ট বন্ধু মেয়েটিকে অপহরণ করে। তারপর ছেলেটাকেও একজন প্রবল বিখ্যাত জলদস্যু বন্দি করে। গীতিকার শেষে একজন বুড়ো সাধু বণিক সেই দম্পতির সব বিপদ

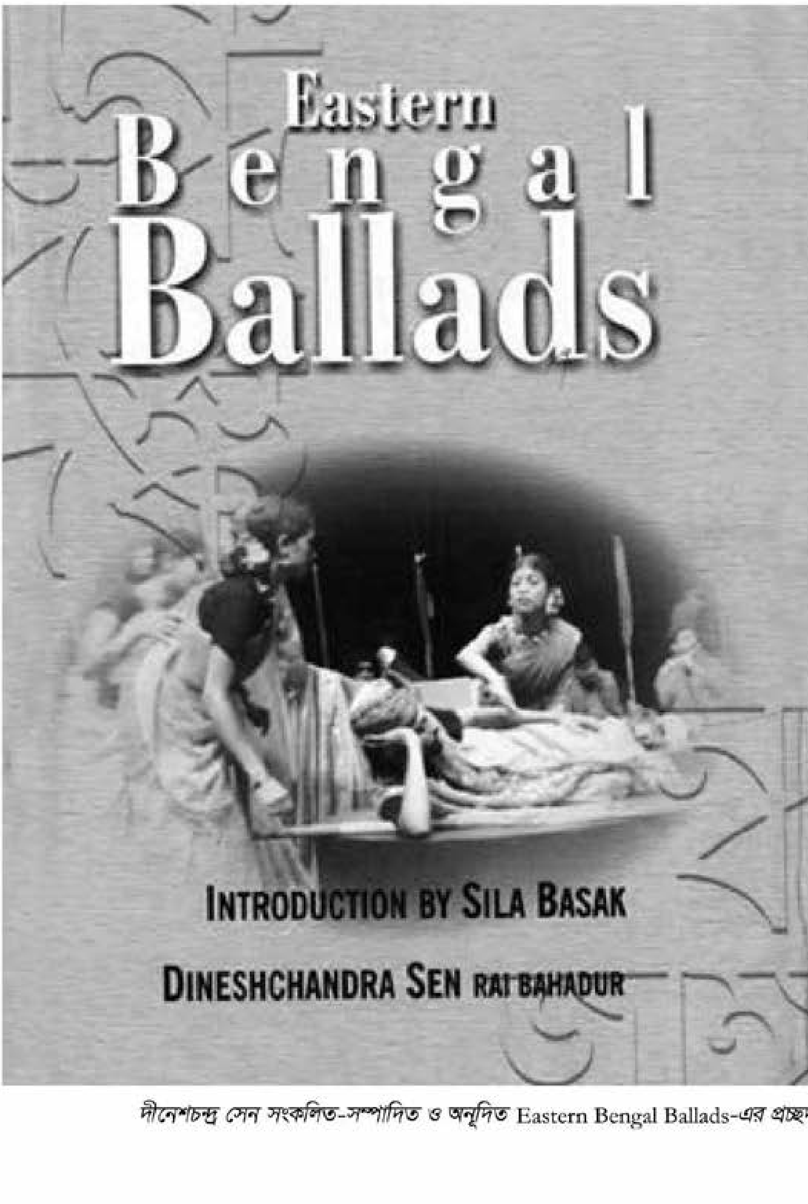

দীনেশচন্দ্র সেন সংকলিত-সম্পাদিত ও অনূদিত Eastern Bengal Ballads-*এর প্রচ্ছদ*

ও দুঃখ হতে উদ্ধার করেন। বাড়ি ফিরে বাবার আশীর্বাদ পেয়ে ছেলেটি উচিত নিয়মে মেয়েটিকে আর তার দুষ্ট বন্ধুর বোনকে বিবাহ করে।[৭]

দ্বিতীয় গীতিকাটির ছেলে আর মেয়ের একই মুসলমান বংশে জন্ম হয়, তাদের বিবাহ-বিরোধে কোন আপত্তি নেই, কিন্তু বিবাহের পরে পতি লজ্জা-শরম মানে না, বউয়ের সঙ্গে রতি-রঙ্গ ভোগ করে, আর তাতে তার ছোট বোনের ঈর্ষা প্রকাশিত হয়। দাদা বাণিজ্য যাত্রায় দূর দেশে গেলে সে-বোন বউয়ের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দেয়, এতে শ্বশুর-শাশুড়ি তাকে শাস্তি দিয়ে দাসীতে পরিণত করে। বাড়ির কাজে ঘাটে গেলে সে অপহরণের শিকার হয়, আর কালক্রমে তাকে দুজন প্রবল মানুষে বন্দি করে, একজন জলদস্যু আর অন্য একজন লম্পট কাজি। পতি বাড়িতে ফিরে এসে, তার নিজের দোষী আর বউকে নির্দোষী ঘোষণা করে, আর ফকির হয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে গিয়ে স্থানে স্থানে তার দুঃখের গান গাইতে থাকে। সেই গান শুনে বউটি দৈবাৎ তার পতিকে চিনতে পারে এবং তাঁকে তার বন্দি দশার বার্তা পাঠিয়ে দেয়। জলদস্যু ও কাজি উভয়ে কোন রাজার অধিকার মানে না, তাদের পাপ কোন রাজার দৃষ্টি-গোচরে পড়ে না; তাহলে গীতিকার প্রয়োজন আছে, যে-ছেলের বাবা রাজার মত মহাজন, যাঁর অধিকারে রণতরী আর সৈন্য ছিল। তিনি যুদ্ধ করে উভয় দুষ্ট মানুষদের পরাজিত করেন আর বউটিকে মুক্ত করে বাড়িতে ফিরে আসতে চান। কিন্তু বউটি বন্দিদশায় কাজির সঙ্গে নিকা-বিবাহে বাধা দেবার চেষ্টায় না-খেয়ে ছিলেন, তার ফলে জীর্ণ অসুস্থ শরীর নিয়ে যাত্রাপথে বউটি মারা যান।[৮]

উভয় গীতিকাতে দম্পত্য-প্রেম অনুভূতিকে (sentiments of conjugal love) সমর্থন করে। যে দুষ্ট চরিত্ররা কোন নিয়ম মানে না, নিজ আকাঙ্ক্ষায় প্রেম বিরোধে ছেলে-মেয়েকে আক্রমণ ও বন্দি করে, গীতিকায় তাদের বিজয় ও মরণের বৃত্তান্ত শুনে শ্রাবকদের আনন্দ হয়। গীতিকায় যে মেয়ে মা-বাবার আদেশ না শুনে নিজের অপহরণ ও বিবাহের ব্যবস্থা করে সে পতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুঃখ পায়। তারপর আবার মিলনে অল্প কাল আনন্দ পায়। গীতিকার শেষে সে-মেয়ের মরণের কথা শুনে শ্রাবকদের তীব্র হরিষ-বিষাদ হয়। যখন দুষ্ট মানুষেরা ছল করে মেয়েকে অপহরণ করে, অথবা একজন নতুন পতি আদিরসে তার লজ্জা-শরম ভুলে যায়, দৈবাৎ শাস্তি পেয়ে দুঃখিত হয়—তা শুনে শ্রাবকরা অনুভব করত যে শেষে ছেলে-মেয়ের আবার মিলন হবে। তাহলে প্রেম-গীতিকা শুনে, শ্রাবকদের দেশ-সমাজে যে জাতি ও ধর্ম-সম্প্রদায়ের একরূপতা ও সীমা-বদ্ধতা (religious identities and boundaries) ও ধনী-দরিদ্রদের যে পৃথকত্ব ছিল তা একটু হলেও বিস্মরিত হয়।[৯]

রঙ্গমালা সুন্দরী বা চৌধুরীর লড়াই

যে-গীতিকাটি নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করবো, তার দুটো নাম আছে—*রঙ্গমালা সুন্দরী বা চৌধুরীর লড়াই*। এর দুজন প্রধান চরিত্র ঐতিহাসিক দলিল-পত্রের চেনা লোক, এমনকি সে-চরিত্রদের আসল স্থান এবং কাল সম্পর্কেও ঐতিহাসিক নথিতে তথ্য পাওয়া

যায়। এই ঐতিহাসিক চরিত্র হলেন—নোয়াখালী বাবুপুর জমিদার রাজেন্দ্র চৌধুরী এবং তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র রাজচন্দ্র চৌধুরী। রাজেন্দ্র তাঁর দাদার মৃত্যু পরে বাবুপুরের জমিদারি অধিকার করেন। ১৭৬২-১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ও তাঁর ভ্রাতিস্পুত্রের মধ্যে একটি লড়াই সংঘটিত হয়।

পূর্ববঙ্গে তখন ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথমে প্রবল প্রভাব বিস্তর করে, কোম্পানির কর্মাধ্যক্ষগণ পূর্ববঙ্গের জমিদারদের থেকে রাজস্ব সংগ্রহ (land revenue collection) করে, এবং তারা নুন ও অন্যান্য বেশ লাভকর দ্রব্যের ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে। তাঁদের নানা উৎপীড়ন বিরোধে নবাব মীর কাসিম আলী খাঁ ঢাকার ফৌজদার মুহাম্মদ আলীকে আজ্ঞা করেন যে, তিনি পূর্ববঙ্গের কয়েকজন জমিদারের সাহায্যে কোম্পানির কর্মাধ্যক্ষদের নিকট থেকে নিজ বাণিজ্যের উপর উচিত খাজনা বা রাজস্ব না পেয়ে তাদের সব ব্যবসা জোর করে রোধ করেন। মুহাম্মদ আলীর সহযোগী জমিদারদের মধ্যে ছিলেন বাবুপুরের রাজেন্দ্র চৌধুরী। তাঁর কাকার বিরোধে ভাইপো রাজচন্দ্রের সঙ্গে কোম্পানির মৈত্রী হয়।[১০] মেঘনা ও ফেনী নদীর মধ্যে আর সমুদ্র তীরের দু-এক ক্রোশ থেকে বাবুপুর জমিদারদের পুর ও বাড়ি। ইংরেজদের দলিল-পত্রে রাজেন্দ্র ও রাজচন্দ্রের মধ্যে যে-দাঙ্গার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, "রঙ্গমালা সুন্দরী বা চৌধুরীর লড়াই" গীতিকাতেও তা পাওয়া যায়। গীতিকাটিতে চৌধুরীর লড়াইয়ের কারণ স্বরূপ রাজচন্দ্রের জাতি-নিয়ম লঙ্ঘিত বিবাহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

দীনেশচন্দ্র সেন ও ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিকের নির্দিষ্ট দুটি পাঠ তুলনা করলে কিছু বৈসাদৃশ্য অবলোকন করা যায়। মৌলিকের পাঠ সেনের আগে রচিত, তার নানা প্রমাণ আছে। সেনের পাঠে মোটামুটি মৌলিকের পাঠ অনুসৃত হয়েছে, কিন্তু তার ঘটনার অনুক্রম কিছুটা বদলে গেছে, আর কয়েকটি গুরুত্বর্পূণ নতুন ঘটনা সেনের পাঠে সংযোজিত আছে। মৌলিক অনুসন্ধান করেছেন যে, পাঁচ জন মুসলমান লেখকদের বইতে সেই গীতিকা বিংশ শতকের শুরুতে প্রকাশিত হয়েছিল।[১১] মৌলিকের মতে, সেনের পাঠ ও তাঁর পাঠ প্রায় একই রকম। মৌলিকের মনে পড়ে যে, তাঁর ছেলেবেলাতে একজন গায়েনের কাছ থেকে তিনি অন্যরূপে গীতিকাটি শুনে ছিলেন। অনেক বছর পরে ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সেই গায়েনের বাড়িতে যান, কিন্তু ততদিনে গায়েনের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু মৌলিক সেই গায়েনের ছেলে কাছ থেকে বাবার হাতেলেখা গীতিকার একটা পুঁথি দেখতে পান। তিনি আন্দাজ করেন যে, পুঁথিটা উনবিংশ শতকের মধ্যে নকল করা হয়েছিল। পরিবারের বংশাবলি দেখিয়ে ছেলেটা বলেন যে, রঙ্গমালা সুন্দরীর আদি-কবি ছিলেন তার বাবার অষ্টম পূর্বপুরুষ।[১২] কিন্তু মৌলিকের আবিষ্কৃত পুঁথিতে যে পাঠে রঙ্গমালা সুন্দরী আছে, আর তিনি যা প্রকাশ করেন—সেটা কি গীতিকার আদি রূপ? তা অনিশ্চিত। তার রচনার কাল নিশ্চয় ছিল। রাজেন্দ্র ও রাজচন্দ্র চৌধুরীর জীবিত কাল অনেক বছর পরে। রাজেন্দ্রের আগে যে জন ছিলেন বাবুপুর জমিদার আর রাজচন্দ্রের বাবা, গীতিকার মৌলিকের পাঠে তাঁর নাম ভুল আছে।[১৩]

সে জমিদার ও রাজা ছিলেন প্রতাপনারায়ণ চৌধুরী। উনি যখন মরে যান, তখন তাঁর ছোট ভাই রাজেন্দ্র সম্পূর্ণ জমিদারি অধিকার করেন। তারপর, রাজেন্দ্র ও প্রতাপনারায়ণের একমাত্র পুত্র রাজচন্দ্রের মধ্যে বড় একটা বিবাদ হয়। গীতিকাটির

দীনেশচন্দ্র সেন সংকলিত-সম্পাদিত পূর্ববঙ্গ গীতিকায় মুদ্রিত অঙ্কিতচিত্রে রঙ্গমালা ও রাজচন্দ্র

বিবরণে বিবাদের কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে—রাজচন্দ্র ও রঙ্গমালার মালা বদলের মাধ্যমে নিভৃত বিবাহ। বাবুপুর চৌধুরীরা শূদ্র। রঙ্গমালার জাতি নর (নট্ট), বাল্যকালে তাদের ছেলেরা নাচ করত, এবং মানুষেরা বাদ্যযন্ত্র বাজাত। তারা নীচু শূদ্র ছিল, তাদের

দীনেশচন্দ্র সেন সংকলিত-সম্পাদিত পূর্ববঙ্গ গীতিকায় মুদ্রিতচৌধুরী বাড়ির কামান

কাছ থেকে বাবুপুর চৌধুরীরা জল নেবেন না। জমিদারের ছেলের যদি নাঁড় মেয়ের সঙ্গে বিবাহ হয়, চৌধুরীর জাতি ভঙ্গ হবে। তাহলেও রঙ্গমালার সঙ্গে তাঁর বিবাহ নিভৃত রাখলেন না রাজচন্দ্র।[১৪]

রঙ্গমালা ও রাজচন্দ্রের দেখা ও সম্মুখীন হওয়া

এই অসমাপ্ত বিবাহের পরে গীতিকার একটি পালাতে রঙ্গমালা ও রাজচন্দ্রের প্রথম দেখা ও সম্মুখীন হওয়ার বিবরণ প্রকাশ করে। সেন ও মৌলিকের দুইজনার সম্পাদনাতেই পালাটি দীর্ঘ এবং এর হাস্যরস মোটামুটি সাদৃশ্যপূর্ণ। প্রথম দৃষ্টিপাতে রঙ্গমালাকে প্রলুব্ধ করা তার বাহ্য বিষয় (apparent subject)। পালাটির প্রথম ও নানা দিকে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র একজন বুড়ি, তার নাম শ্যামপ্রিয়া বৈষ্ণবী, যে তার জাতির ছাঁচের মত ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করত, আর এই ছুতোতে সে বড় লোকের বাড়ির অন্তঃপুরে প্রবেশ করত, পুরুষ-মানুষের সঙ্গেও আলাপ করত। যখন সে যুবতী ছিল তখন সে প্রণয়িণী নাগরী ছিল, বুড়ো বয়েসে সে রাজচন্দ্র ও রঙ্গমালার পরিচয় করে দেওয়ার কাজে দূতী হিসেবে ভূমিকা রাখে। মৌলিকের সম্পাদনাতে রঙ্গমালা শরম রাখতে মেসো-বাবার ঘরে থাকত, অধিকন্তু রাজচন্দ্র ও তার জাতির মধ্যে একটু দূরত্ব বজায় রাখত। কিন্তু তাদের মিলন প্রকাশ পেলে রাজচন্দ্রের শূদ্র জাতি ভেঙে যায়। পালার অন্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র রাজচন্দ্রের বীর রামভাঁড়ালী। সে স্বার্থচিন্তা করে রাজচন্দ্রের কাজ করত, আর এই পালায় সাধারণত তার কার্য্য রঙ্গমালার বিপক্ষে।

মেয়েটিকে প্রলুব্ধ করার কাণ্ড মোটামুটি গোপনে হয়, যাতে সর্বজনে না জানে। তাহলে গায়েনরা সে পালার ঘটনাগুলো মনে মনে উদ্ভাবন করেন। আসলে পালাটির মাধ্যমে ইতিহাস (narrative) গঠন করা ছাড়া তাঁদের কোন উপায় ছিল না। এ পালাটি আমাদের ভাল করে জানিয়ে দেয় যে, গায়েন ও শ্রাবকদের ভাব-ভাবনা ও রস-রুচি (sentiments and tastes) কি কি ছিল।

দেশের ছাঁচ অনুসারে পালার দুই প্রধান চরিত্রের গঠন। রাজচন্দ্র নামের যুবক রাজকুমারকে তার কাকা-কাকি অতিশয় প্রশ্রয় দিতে গিয়ে তার কুবুদ্ধি ও বদখেয়ালে কোন বাধা দান নি। উভয় সম্পাদনাতে গীতিকাটির আদি পর্বের উপকথায় এমন গল্প আছে: যেহেতু বাবুপুর যুবরাজ রাজচন্দ্র অনাক্রম্য, আর তার কাকা ও কাকি তাকে প্রশ্রয় দিতেন, রাজচন্দ্র স্বৈর হয়ে দেশের নারীদেরকে আহত করত। একজন ব্রাহ্মণ মেয়েকে ধরতে গিয়ে, মেয়েটির উপরে তার হাত পড়ে, তাকে দুষিত করে।[১৫] একজন যুগী (তন্তুবায়) মহিলা যখন একা তার ঘরে কাজ করেছিল, রাজচন্দ্র তাকে অতর্কিতে আক্রমণের মাধ্যমে ধর্ষণের চেষ্টা করে। যোগী মহিলা তাকে মারতে মারতে পলায়ন করে।[১৬] উভয় উপকথায় জাতির বাঁধা-ধরা ছাঁচ অনুসারে নারীর চরিত্র গড়ে উঠেছে। দুজন নারীদের পরিবারের লোক যখন রাজার দোহাই দিল, রাজা ও রানি তাদের দোহাই মানেন না। তাহলে বাবুপুর ব্রাহ্মণ মানুষেরা রাজপুত্রকে ন্যায্য শাস্তি দিতে সৈন্য স্বরূপ একত্র করেন। কিন্তু যে চৌধুরীদের বিপক্ষে দু-এক শত ইঁদুর ব্রাহ্মণ সৈন্য ছিল,

ব্রাহ্মণদেরও সে সত্য স্বীকার করতে হল, আর কোন সংগ্রাম না করে নিজেদেরকে ভঙ্গ দিয়ে ঘরে ফিরে আসতে হল।[১৭] বাবুপুর ব্রাহ্মণেরা শপথ করেন যে চৌধুরীদের আচার অনুষ্ঠানের কোন কার্য্য করবে না, কিন্তু মৌলিকের সম্পাদনাতে এ শপথ পালন করার অত ক্ষমতা ব্রাহ্মণদের নেই।[১৮] মেঘনা নদীর পূর্বে সমুদ্রের কাছে প্রায় জঙ্গল দেশে বাবুপুরের ব্রাহ্মণেরা অল্প কয়েকজন ছিলেন, সে কারণে বাবুপুর শুদ্র রাজ-বংশ চৌধুরীরা তাঁদের অভিযোগ উপেক্ষা করতেন আর তাঁদের সামাজিক নিষেধও মানতেন না। গীতিকাটির বর্ণনাতে দেখা যায় সে দেশে জাতি নিয়ম-বান্ধন অত দৃঢ় ছিল না।

রঙ্গমালার "নর" (নট্ট) জাতি অতি নীচ, অধিকন্তু তার মা-বাবা মরে গিয়েছিল। গীতিকাটির আর একটি উপকথায় আছে যে, তাদের মেসো বাবার রূপে অল্প বয়েসে রঙ্গমালা ও তার ছোট ভাইকে পালন করতে রাজী হন। পরে সে পোষক স্বরূপে ঘুষ নিয়ে এক ধনী পরিবারের কুঁজ ছেলের সঙ্গে রঙ্গমালার বিবাহ স্থির করেন। বিবাহের দিন যখন পতির দৃষ্টিপাত হল তখন রঙ্গমালা সেই বিবাহ এবং পতিকে প্রত্যাখ্যান করে। মৌলিকের পাঠে জানিয়ে দেয় যে, রঙ্গমালা তখন থেকে "চিনল আপন পর"।[১৯]

পালাটির হাস্যরস বর্ধনে এই ছাঁচগুলো এবং তার সঙ্গে রসিক প্রবাদও ব্যবহার করা হয়েছে। নিশ্চয় পালার আখ্যানে বর্ণিত ঘটনা ও রস নির্ভর করে দেশের সুপরিচিত আচার ও ধারণা উপর। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় একটি বিষয়-বস্তুর কথা, যেমন—দূতী শ্যামপ্রিয়া বৈষ্ণবীর বিশেষ দ্রব্যের উপর মন্ত্র পড়ার ক্ষমতা রাখে। মন্ত্র পড়ে স্যামপ্রিয়া যখন দ্রব্যটা রঙ্গমালাকে স্পর্শ করায় বা খাওয়ায় তখনই রঙ্গমালার মনে প্রেম অনুভুতি প্রবেশ করে, তাকে ভোলায়। যুবতী কালে মেয়েটা যদি বেরিয়ে যায়, তাহলে বিপদে পড়বে।

কিন্তু মৌলিকের পাঠে পালাটি আলাদা ও আশ্চর্য রূপে শেষ হয়। রঙ্গমালা ঘরে ফিরে এসে তার "বাবা" ও ছোট ভাইকে ভবিষ্যতের কথা বলে দেয় এইভাবে— "আবার আমি বিয়া করমু আমার আখেরে (ভবিষ্যতের) মুখ চাই। বামুণ ডাকি ন হইব বিয়া সমাজের বেবস্থা নাই। মালা বদল বিয়া হইব আপাগর (আপনার) অনুমতি চাই।"[২০] তার দূতীকে রঙ্গমালা স্পষ্ট করে বলল যে, (গোপনে) মালা বদলের মাধ্যমে বিয়ে করলে রাজচন্দ্রের জাতি থাকবে, যদিও "তিনি ত শূদ্রের বংশ আমি নরের ঝি"। দূতীর মাধ্যমে রজচন্দ্রকে অঙ্গীকার করান যে, আপনি বাড়িতে আসবেন এবং মালা বদলের মাধ্যমে বিয়ে করবেন, তাহলে "আমারে লইতে পারে ধর্ম সাক্ষী করে"। নইলে "এই সোংসারে আমার সাথে আর দেখা হইব না"।[২১] নিশ্চয় আত্মহত্যা নারীদের সবচেয়ে প্রবল শাস্তি দানের ক্রিয়া।[২২] রাজচন্দ্র নিভৃত রঙ্গমালাকে বিবাহের আগে দূতী ও রঙ্গমালার কাছে শপথ করল যে "রঙ্গমালারে ছাড়ি সোংসারে আমার কন সুখ নাই" আর "রাজরাজত্বি যায় যাউক কুল মান। কিছু ন গণিব আমি তোমার সোমান"। রঙ্গমালাকে রাজচন্দ্র বলল, "ইহজীবনে আমি তোমাকে এড়াইব না"।[২৩] কিন্তু এই রাজচন্দ্রকে সমাজ মানতে পারবে না, আর তাদের মালা বদল করা বিবাহও গুপ্ত থাকবে না।

আশ্চর্য বিষয় যে, সেনের সম্পাদনায় রাজচন্দ্রের বিবাহের কোন কথা নেই। তার স্থানে রঙ্গমালা মিনতি করেন যে, রাজচন্দ্র তার (রঙ্গমালার) নর পরিবারের জন্যে এক

বৃহৎ দিঘি খনন করাবেন, আর এক নওবতখানা গড়াবেন। এমন মিনতি শোনাতে শোনাতে তিনি রাজচন্দ্রের সম্মতি পান।[২৪]

রঙ্গমালার দিঘি কাটার পালা

পালার একটি অংশের নাম "রঙ্গমালার দিঘি কাডার (কাটার) পালা"। তার কাজ-কর্ম পুরুষদের দ্বারা কৃত, ও তার ঘটনাগুলো তাড়াতাড়ি প্রকাশ ও বিদিত হয়। ক্রমশ চরিত্রদের প্রতি তার স্থায়ী ভাব সমবেদনা প্রকাশ পায় (পালার শেষে তাদের দুঃখ আর কাতরতা দেখা যায়)। রঙ্গমালার মানা না শুনে রাজচন্দ্র তার পরিবারের জন্যে এক বৃহৎ দিঘি মগ মজুরদের দ্বারা খনন করাল।

যখন দীনেশচন্দ্র সেনের সাহায্যকারী বাবুপুরেতে গিয়ে গীতিকাটির কথা শোনেন তখন একই সাথেগ্রামের লোকে তাকে দিঘিটি ও বাবুপুর গড় দেখান, এবং সাহায্যকারী সংগ্রাহক স্থানগুলির ছবি তুলে নেন।[২৫] যেহেতু আঞ্চলিক লোকেরা গড় ও দিঘিটার জায়গা চিনত তাই চৌধুরীদের এবং রঙ্গমালার ঐতিহাসিক বাস্তবতাও সন্দেহের অতীত। দিঘিটার গল্পে কয়েকটি বিষয় সংযুক্ত ও ব্যক্ত করে (unites and exposes several themes) পুরুষত্ব ও পুরুষের নাম ও মান-সম্ভ্রম, জমিদারির অধিকার, উত্তরাধিকার ও হস্তান্তরিত করা, ও জমিদারির অধিকার হয়ে না হয়ে রাজ্য দখল করার বিভিন্ন ঘটনা। দিঘিটি খননের জন্যে রঙ্গমালার প্রেম জানাজানি হয়ে যায়।

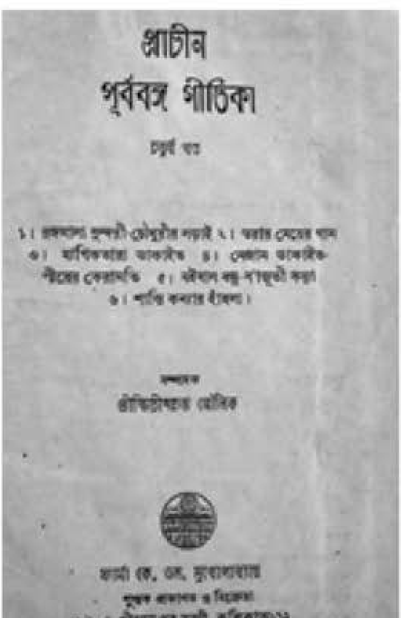
প্রাচীন
পূর্ববঙ্গ গীতিকা

ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকার আখ্যাপত্র

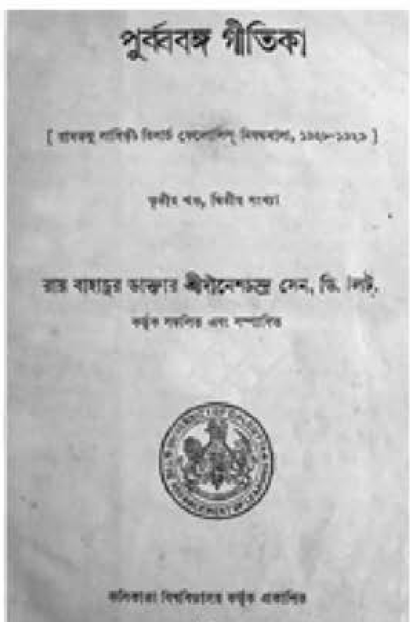
পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা

দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত পূর্ববঙ্গ গীতিকার আখ্যাপত্র

কেমন করে দিঘি খনন বাবুপুর চৌধুরী রাজেন্দ্র ও রাজচন্দ্রের বিবাদের হেতু হল, তেমন একটা ইতিহাস পালাটি বর্ণনা করে। দুইজন পুরুষ-মানুষের বিবাদ সংঘর্ষে পরিণত হয়। প্রথম ছিল রাজেন্দ্র চৌধুরীর চাঁদভাঁড়ালী, তিনি ছিলেন রাজা রাজেন্দ্রের বলিষ্ঠ বীর এবং প্রধান উপদেষ্টা, আর দ্বিতীয় ছিলেন ইঙ্গা চৌধুরী, নবাবী পদস্থ একজন শরীফ মুসলিস।

চাঁদের চরিত্র হিংসুক ও যুদ্ধেতে অজেয়। রঙ্গমালা রাজচন্দ্রকে বলেছিল যে, যদি সে দিঘি কাটে তাহলে রাজেন্দ্র "চাঁদভাঁড়ালীরে পাঠাই আমাগো মাথা কাডি নিব॥ নরর পাড়া জ্বালাই দিব ঘরৎ আগুন দিয়া। দেশেরতুন নরজাতিরে দিব খেদাড়িয়া॥" কিন্তু রঙ্গমালাকে রাজচন্দ্র আগেই দিঘির কাটার "কথা দিয়াছি" বলে অঙ্গীকার করেছিলেন, আর রাজপুত্রের শপথ অন্যথা হতে পারে না।[২৬] পুরুষ-মানুষকে মান রাখতে হয় বলে

দীনেশচন্দ্র সেন সংকলিত-সম্পাদিত পূর্ববঙ্গ গীতিকায় মুদ্রিত মাহাম্মদ রাজা ও সৈন্যদল

সে তার নারীর উপদেশ শোনে না। রামভাঁড়ালী রাজচন্দ্রকে বিজ্ঞাপিত করল যে “দিঘি কাটনের কথা” গুপ্ত থাকবে না, আর রাজেন্দ্র তা শুনলে নিশ্চয় ঝামেলা বাধাবেন। খুড়া রাজেন্দ্র যদি তার বাবার নিজ অধিকারে বাবুপুর জমিদারির নয় আনা হিস্যা রাজচন্দ্রকে দেয়, তাহলে রাজচন্দ্র স্বতন্ত্র রাজা হবে। না হলে, রাজচন্দ্রকে প্রবল ইঙ্গা চৌধুরীর সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।[২৭]

এই রূপে ইঙ্গা চৌধুরীর পরিচয় জানিয়ে দেয়, পালাটির দ্বিতীয় পুরুষ-মানুষ। তাঁর বংশ আশরাফ মুসলিম, উনি নবাবের দেওয়ান ছিলেন, ভাটি দেশের জমিদারদের কাছ থেকে রাজকর আদায় করা তাঁর দায়িত্ব। তাঁর উক্তি: “আমি হেন জমিদার ভাটি বাংলায় নাই। আর জমিদার চলে আমার ডরাই॥”[২৮] রাজেন্দ্র স্বীকার করলেন যে, বাবুপুর সনদের মাধ্যমে সাবালক হলে রাজচন্দ্রের নয় আনার অধিকার পাবেন, আর রাজেন্দ্র এমনভাবে বিভক্ত করার জন্য দলিল লিখলেন। কিন্তু চাঁদভাঁড়ালী সে দলিল ছিঁড়ে ফেলে দেয়।

এদিকে রাজচন্দ্র ইঙ্গার কাছে গিয়ে তাঁকে শপথ করেন যে, তাঁর সাহায্যের বিনিময়ে তিনি তাঁকে জমিদারির চার আনা হিস্যা দেবেন। একথা শুনে ইঙ্গা তাকে আদেশ করেন যে, চার আনার হিস্যার দলিল লিখে নাম সই করলে তিনি রাজচন্দ্রের নয় আনা হিস্যার দখল প্রতিষ্ঠিত করবেন। রাজেন্দ্রের বীর চাঁদভাঁড়ালী এই মৈত্রীবন্ধনের গোপন চক্রান্ত ও শর্তাবলী অবিস্কার করে। চাঁদের উপদেশ অনুসারে রাজেন্দ্রও ইঙ্গাকে মৈত্রী প্রস্তাব করা পাত্র পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তারপর ইঙ্গা ও রাজেন্দ্রের মধ্যে যে আপোশের আলাপ হয়, তা হল—সে ইঙ্গার সাথে রাজেন্দ্রের পক্ষে প্রবঞ্চনা করা সম্ভব হতে পারে, সন্দেহপূর্ণ মনে ইঙ্গা ভাবে যেন “আগে দোস্তী পরে খোস্তি” তাঁদের জীবনে এমনটা না হয়।[২৯]

চাঁদভাঁড়ালী নিজে স্থির করে যে গুপ্তঘাতক হয়ে ইঙ্গার দুর্গের প্রবেশের মাধ্যমে ইঙ্গাকে অতর্কিতে আক্রমণ করবে। আর গীতিকাটির দুটো সম্পাদনার বৃত্তান্ততে আছে যে, চাঁদভাঁড়ালী ইঙ্গা ও তাঁর ছোট ভাইকে ইঙ্গার দুর্গে বধ করে।[৩০]

যদিও ইঙ্গা নবাবের উচ্চ পদে নিযুক্ত ও প্রবল শক্তিশালী মুসলমানদের কুলে তার জন্ম হয়েছিল, তাঁর অপূর্ব নাম “ইঙ্গা চৌধুরী” ইতিহাসের দলিল-পত্রতে পাওয়া যায় না। কিন্তু “ইঙ্গবঙ্গ” মানে যেমন “আধা-ইংরেজ ও আধা বাঙ্গালা”, তেমন “ইঙ্গা” নাম দিয়ে পালাটি বুঝিয়ে দেয় যে, ইংরাজি কোম্পানির সঙ্গে ইঙ্গার কোন সম্পর্ক ছিল। আমরা দেখতে পাই যে, বাস্তবিক এক ইতিহাসের ঘটনা অনুসারে সেই ইঙ্গাকে আক্রমণ করার উপকথা রচিত। ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানির কয়েকজন সেপাহি এক নবাবি সৈন্যদল জয় করে, আর বাবুপুর জমিদার রাজেন্দ্র চৌধুরী নবাবি দলের পক্ষাবলম্বনে যুদ্ধ করেন।

মৌলিকের সম্পাদনায় চাঁদ দ্বারা ইঙ্গার বধের কথা শুনে রাজেন্দ্র ভয় পান যে ইঙ্গার প্রবল বংশ তাঁর প্রতিশোধ নিতে বাবুপুর চৌধুরী সংসারকে বিনাশ করবে। ইঙ্গার প্রতিশোধ প্রশমন করতে রাজেন্দ্র বাবুপুর জমিদারি বিভক্ত করেন এবং রাজচন্দ্রকে তার নয় আনা হিস্যার অধিকার দেন (কিন্তু ইংরেজি কোম্পানির দলিল-পত্রে এই জমিদারি বিভক্তকরণের কোন প্রামাণিক সাক্ষ্য নেই)। স্বতন্ত্র রাজা হয়ে রাজচন্দ্র একজন মগ সরদার ও তার মজুরের দল নিযুক্ত করেন। যেহেতু সে রঙ্গমালার

"বাবাকে" অঙ্গীকার করেছিল যে তার নর পরিবারকে এক বৃহৎ দিঘি খনন করিয়া দেবে। নতুন দিঘির স্থাপন করতে দেশের আচার-অনুস্থান অনুসারে, সে ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে নিমন্ত্রণ দেন, আর ব্রাহ্মণ যখন নিমন্ত্রণ মেনে নিতে অসম্মত হন তখন রাজচন্দ্র তাঁকে জোর করে ভয় দেখান।[৩১]

দিঘিতে জল তোলার অনুষ্ঠানে ভোজন হবে। রাজচন্দ্র "খুড়া ও খুড়ী দুই জনে"র জন্য নিমন্ত্রণপত্র লিখে জানান যে, "চিড়া দৈ ফলার খাই জল তোলা দেখিবা", যদিও এই ভোজন করালে রাজচন্দ্র জল-অচল-শূদ্র নরদের জল-চল শূদ্রতে উত্তোলন ও উন্নতি করবে, অথবা ব্রাহ্মণ পুরোহিতের ও বাবুপুর চৌধুরীর জাতি যাবে।[৩২] রঙ্গমালা নিমন্ত্রণপত্রটি না পাঠানোর জন্য তার পা ধরে মিনতি করে। কারণ, চাঁদভাঁড়ালীকে সে ভয় করে রাজচন্দ্রকে বলে:

দারুন রাজিন্দর খুড়ার হুকুম যদি পাইবে।
নর বংশের মণ্ডে লই গুলি্ত খেলাইবে॥[৩৩]

কিন্তু রঙ্গমালার মিনতি উপেক্ষা করে রাজচন্দ্র তার কাকাকে নিমন্ত্রণ দিতে ঘোড়ায় চড়ে চৌধুরীর বাড়িতে গেলেন। ইতিমধ্যে চাঁদভাঁড়ালী "মিঠা (মিষ্টি) ভাঙ্গের সরবত" তৈরি করে তার উপরে এমন মন্ত্র পড়ে দেন যেন তা যে খাবে তার সারারাত ভাং নেশা থাকে। চাঁদভাঁড়ালী সে শরবত রাজচন্দ্রের বোনকে দেন এবং তা রাজচন্দ্রকে খাওয়াতে আদেশ করেন।[৩৪] তারপর চাঁদ নর বাড়িতে গিয়ে প্রহরা রাম্যা মগের সঙ্গে যুদ্ধ করে। দু প্রহর পরে চাঁদ জয় লাভ করে আর "এক কোবে (কোপে) রাম্যার মুণ্ড ফেলাইল কাড়িয়া (কাটিয়া)"।[৩৫] রঙ্গমালার সামনে এসে চাঁদভাঁড়ালী তাকে ও তার ভাইকে বন্দি করে, আর কলা গাছ এনে "যন্তর"(পশু বলি দান দেওয়ার হাড়ি কাঠ) বানালে রঙ্গমালা বলে: "লই রাজচন্দরের নাম, চান্দভাঁড়ালী কাটি মুণ্ড করিল দুই খান॥"[৩৬] এরপর চাঁদ নর ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়।

তারপর চাঁদভাঁড়ালী রঙ্গমালার মুণ্ড এক চাদরেতে বেঁধে চৌধুরী বাড়িতে নিয়ে আসে এবং তা রাজেন্দ্রকে খুলে দেখায়। কিন্তু রঙ্গমালার কাটা মুণ্ড দেখে রাজেন্দ্র হাহা করে বলে ওঠেন:

এই মাইযা (নারী) হৈতে যদি শূদ্র বংশ ঘরে।
লক্ষ ট্যাকা দি বিয়া করাইতাম আমি ভাতিজারে॥
আগে যদি জাইনতাম রে এমন রঙ্গমালা।
বুঝিতে পারতাম রে আমি ভাতিজার জ্বালা॥
যত ট্যাকা লাইগত আমি সমাজে লাগাইতাম।
বিয়া করাইয়া কইন্যা (কন্যা) ঘরে আনাইতাম॥[৩৭]

রাজেন্দ্র যেন রঙ্গমালার মুণ্ড দেখে পাগল হয়ে যান। তখন তার আক্রমণের শিকার হওয়ার ভয়ে চাঁদভাঁড়ালীসেখান থেকে পালিয়ে যান।

দীনেশচন্দ্র সেন সংকলিত-সম্পাদিত পূর্ববঙ্গ গীতিকায় মুদ্রিত চাঁদভাঁড়ালী ও রঙ্গমালা

প্রভাতে নেশার ঘোর কেটে গেলে রাজচন্দ্র নর বাড়ির দিকে আগুনের হু-হু শব্দ শুনতে পান। আর নরবাড়িতে গিয়ে রাম্যা মগের মাথা দেখতে পান এবং উঠানে জ্বালার মধ্যে তিনি রঙ্গমালার ধড় আবিষ্কার করেন। সাথে সাথে দেহটা বের করে এনে গাছ

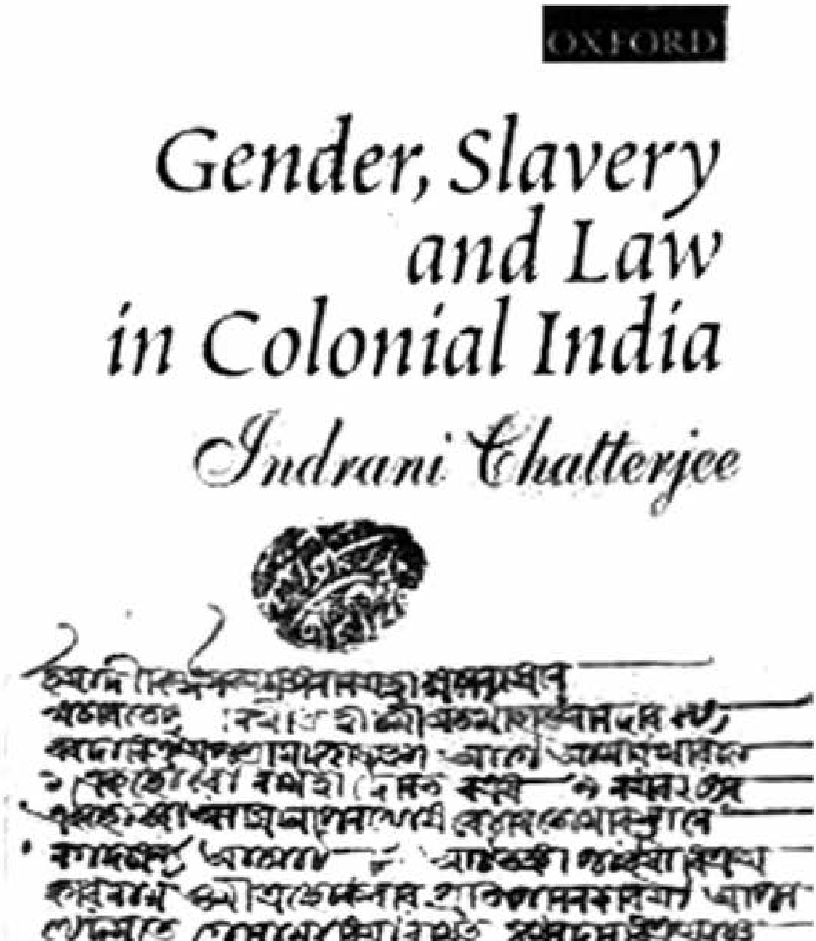

ইন্দ্রানী চ্যাটার্জীর *Gender, Slavery and Law in Colonial India* শীর্ষক গ্রন্থের প্রচ্ছদ

তোলায় বসালেন, কিন্তু তিনি রঙ্গমালার মুণ্ডটি খুঁজে পান না। তৎক্ষণাৎ রাজচন্দ্র শপথ করেন যে, রাজেন্দ্র ও চাঁদের মুণ্ডচ্ছেদ করবেন ও বাবুপুর বাড়ি আগুন ধরাবেন ও চাঁদভাঁড়ালীর মুণ্ড শূলে উড়াবেন। বাড়িতে ফিরে তিনি চাঁদ ও রাজেন্দ্রকে খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে রঙ্গমালার মুণ্ড দেখতে পান এবং দেহটা বাইরে নিয়ে এসে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেন। কিন্তু চাঁদভাঁড়ালী ধূম ও অন্ধকারে এসে তাকে কিল মারতে শুরু করে। রাজচন্দ্র "ভূতে তাকে কিলায়" বুঝে ভয়ে পলিয়ে গেলেন।[৩৮] ফলে চাঁদকে হত্যা করার শপথ পালন করা অসম্ভব হল।

রাজচন্দ্র তার বীরের কাছে গিয়া, তাকে বলল, "আমার আগেতে যদি রঙ্গমালা মরে। করালে আবদ্ধ আছি কাষ্ঠ কৈরতাম তারে" (আমি প্রতিশ্রুতি করেছি যে, রঙ্গমালা যদি আমার আগে মরে, আমি তার শব দাহ্ ও শ্রাদ্ধ করব)। তার বীর পণ্ডিতকে আনতে গেল। রাজচন্দ্র লাশের ধড় ও মুণ্ড জুড়ে ও চিতায় তুলল। পণ্ডিত ঠাকুর মন্ত্র পড়িয়ে দিল, আর "কান্দি কান্দি রাজচন্দ্র আগুন ধরাইল"।[৩৯] গীতিকার শেষ দুটি এই চরণ:

> কত আশা আছিল রঙ্গর কত ভালোবাসা।
> সব শেষ হই গেল ন পুরিল আশা॥
> রূপের আগুন চিতার আগুন এক হই গেল।
> রঙ্গমালা সোন্দরির পালা আদাই হইল॥ [৪০]

এখানে মৌলিকের সম্পাদনায় গীতিকাটি আকস্মিকভাবে সমাপ্ত হয়েছে।

চারটি ঘটনা ও বিকৃত আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে "রঙ্গমালা সুন্দরী বা চৌধুরীর লড়াই" শীর্ষক গীতিকার ঐতিহাসিক গড়ন (composition as a historical narrative) নির্মিত হয়েছে। যার প্রথমটি হল: রঙ্গমালা ও রাজচন্দ্রের গুপ্ত প্রেম ও তাদের মালা বদলের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ পুরোহিত ব্যতীত বিবাহ। যদিও চৌধুরী রাজবংশ লুক্কায়িত বিবাহ্ প্রতিরোধ করতে পারেনি—আপত্তি দেওয়াও সম্ভব ছিল না, কিন্তু রঙ্গমালার পালায় এই বিবাহ্ গোপন রাখাও সম্ভব হয়নি। তার ফলে ঘটনাটি এমন হল যেমনটি রঙ্গমালা নিজে ভবিষ্যৎ ভেবে আশাঙ্কায় গান গেয়ে ছিল:

> সখী, পিরিতি বিষম জ্বালা।
> পিরিতি পিরিতি সবাই করে
> জানেনা পিরিত কাণ্টার মালা॥
> বনে থাকে বনর ফুল রে
> দেইখতে লাগে ভালা।
> মনর বনে পিরিত ফুল
> বাইরে আইনলে কালা—রে—
> সখী পিরিতি বিষম জ্বালা॥"[৪১]

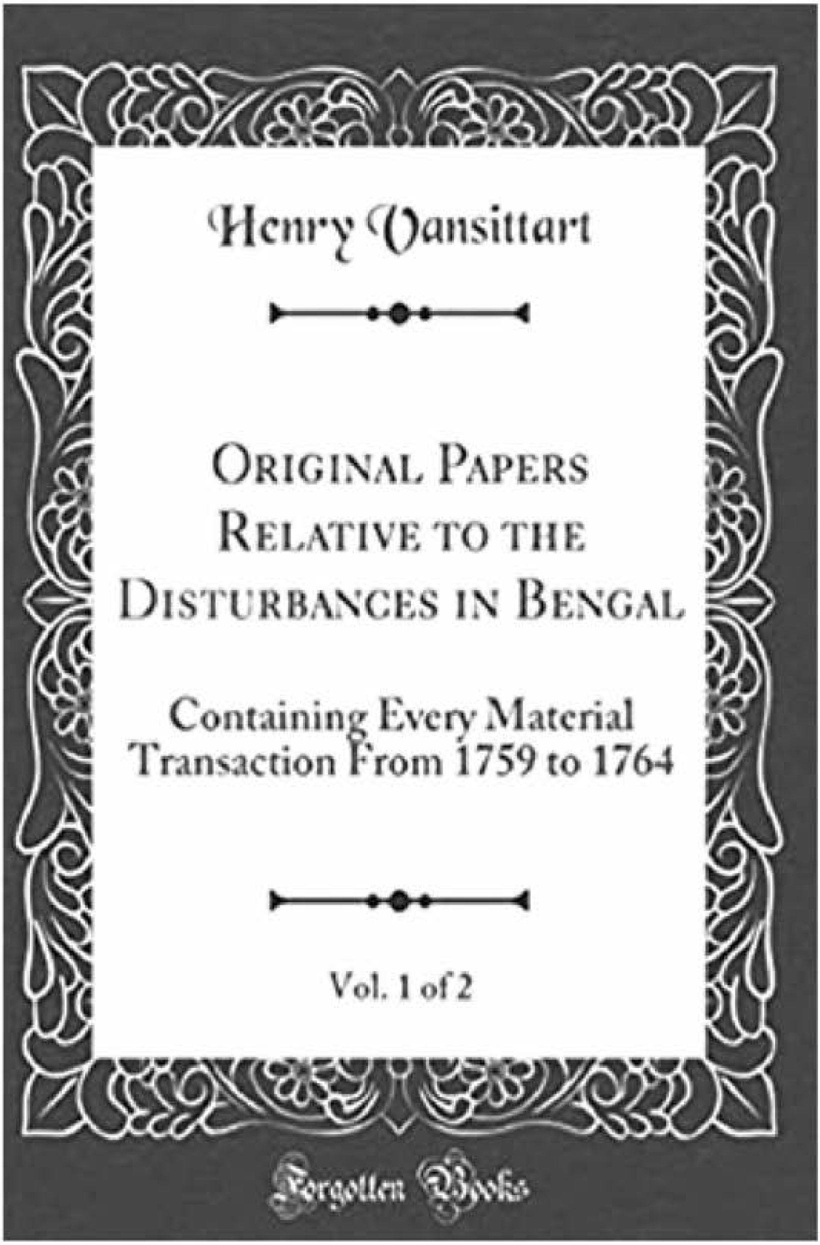

হেনরি ভ্যানসিট্ট্যার্ট-এর *Original Papers Relative to the Disturbances in Bengal, containing every material transaction from 1759 to 1764* শীর্ষক গ্রন্থের প্রচ্ছদ

দ্বিতীয় হল: বিকৃত আচার-অনুষ্ঠান, নর পরিবারের অপূর্ব দিঘিতে জল তোলা ও জনসাধরণ ভোজন, রাজচন্দ্র যাতে রাজেন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করেছিল। ক্রোধান্ধে চাঁদভাঁড়ালী সে নিমন্ত্রণের মধ্যে চুরি করল ও তার জন্যে প্রতিহিংসা গ্রহণ করল।

তৃতীয়টি হল: চাঁদভাঁড়ালী দ্বারা রঙ্গমালা ও তার ছোট ভাইকে বন্ধ করা আর যন্তর উপরে মুণ্ড বিচ্ছেদ্ধ করা।

চতুর্থটি হল: রঙ্গমালার ধড় ও মুণ্ড বন্ধ করে আর চিতায় বসায়ে স্বামী স্বরূপে রাজচন্দ্রে অগ্নি দেওয়া।

রাজনৈতিক ও পারিবারিক প্রশ্ন মৌলিকের সম্পাদনে কোন উত্তর নেই: রাজেন্দ্র ও রাজচন্দ্রের সম্পর্ক কি হবে? ইঙ্গার প্রবল বংশ কি তাঁর খুনে প্রতিশোধ নিয়ে কোন উচিত শাস্তি কাউকে দেবেন না?

সেনের পাঠে গীতিকাটির মূল গল্প

মৌলিকের পাঠে যে জমিদারদের বিবাহের ছবি আঁকা হয়েছে, সেনের পাঠে তার ভিন্নরূপ আছে। সেনের পাঠে রঙ্গমালা উপপত্নী-মাত্র। রাজচন্দ্রের প্রতি তার ব্যবহার নিপুণ, স্বার্থপর, ও স্বকার্যে লাগান।[৪২] সেনের পাঠে—রঙ্গমালা দিঘি খননের জন্য রাজচন্দ্রকে সনির্বন্ধ মিনতি করেন বলে চৌধুরীদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয়। রাজচন্দ্রও তাকে অত ভালোবাসার সুযোগ পাননি। মালা বদল করে নিকার করার মত কোন শপথ রাজচন্দ্রকে করতে দেননি। সেনের পাঠে রাজেন্দ্র স্বীকার করেন না যে, তিনি টাকা দিয়ে দম্পতির উচিত বিবাহের ব্যবস্থা করতে পারেন, কিন্তু তাও সেনের পাঠে নাই। মৌলিকের পাঠে রাজচন্দ্র ও রঙ্গমালার সম্পর্ক দ্বার্থক ও অমীমাংসিত (ambiguous and unresolvable), বরং সেনের পাঠে সে সম্পর্ক শ্লথ ও হালকা। উভয় পাঠে ইঙ্গিত দেয় নাযে, অষ্টাদশ শতকের রাজবাড়ির যে আচার দ্বারা একজন উপপত্নী একটি ছেলের জন্মদান করেন আর ছেলেটা রাজকার্য্যে সাফল্য অর্জন করেন, ছেলেটার মাতা স্বরূপে সম্ভ্রম ও মর্যাদা উপার্জন করতে পারে আর রাজার স্ত্রী পর্যন্ত উন্নতি লাভ করতে পারে। উনিশ শতকের ভারতে ব্রিটিশ সম্রাজ্য যে সংসার ও পারিবারিক আইন পরিচিত করে তাতে রাজার উপপত্নী কোন উপায়ে স্ত্রী হতে পারতেন না এবং তার ছেলেও রাজাসনে কোন মতে বসাতে পারতেন না।[৪৩]

ইঙ্গা ও রাজেন্দ্রের মধ্যে যে রাজনৈতিক বিরোধিতা আমরা দেখেছি মৌলিকের সম্পাদনে, সেনের সম্পাদনে সে বিরোধিতা গায়েনরা সমন্বয় করতে গীতিকার শেষে নতুন ঘটনা গড়িয়ে দিল। তাহলে তারা গীতিকার চরম পরিণতির (climax) স্থানেও পরিবর্ত ঘটান। সেনের সম্পাদনে রাজচন্দ্র রঙ্গমালার ধড় ও মুণ্ড চিতায় অগ্নি দেন না; বরং ইঙ্গার আত্মীয় যে তাঁর উত্তরাধিকারি হন সে মহারাজ বাবুপুর জমিদারি রাজেন্দ্র থেকে নিয়ে ভাইপো রাজচন্দ্রকে প্রদান করেন, আর রাজেন্দ্রকে শাস্তি না দিতে মনস্থির করেন। তারপর রাজেন্দ্র রাজচন্দ্রকেও ক্ষমা করেন, এবং রাজচন্দ্র চাঁদভাঁড়ালীর খুন করার নানা দোষ উপেক্ষা করেন।[৪৪] যেমন সেনের সম্পাদনের গীতিকা বাবুপুর চৌধুরী বংশের একতা প্রতিষ্ঠিত করে তেমনি আবার তাদের চরিত্রদেরও মার্জন করতে চেষ্টা করে।

ইংরেজদের দলিল-পত্রে বাবুপুর চৌধুরীদের লড়াই

এথায় আমরা অনুসন্ধানের দ্বিতীয় পথ অবলম্বন করতে চাই। এক্ষেত্রে আমরা ইংরেজদের নথি, দলিল-পত্র, ও চিঠি ব্যবহার করে বাবুপুরে যখন গীতিকায় বর্ণিত চৌধুরীর লড়াই ঘটেছিল তখনকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ বিচার করে দেখব। কোম্পানির দলিল-পত্রতে বাবুপুরের সামরিক ঘটনাগুলোর উল্লেখ আছে; আর ঢাকা, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা আর সন্দীপ পরগনাতে কোম্পানি বিরোধে যে নবাবি সংগ্রাম ঘটেছিল—কোম্পানির দৃষ্টিকোণ থেকে তার বিবরণ পাওয়া যায়।

পূর্ববঙ্গে এই সংগ্রামের মূল কারণ ছিল, ঢাকাতে ১৭৬১-১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানির উচ্চপদাধিকারীরা দেশের সবচেয়ে লাভজনক দ্রব্যের উৎপাদন ও বিক্রয় দখলের চেষ্টা করেন। বাবুপুরের নানা উৎপাদন মধ্যে বয়ন করা ও বস্ত্র বিক্রয় গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কিন্তু সচরাচর সমুদ্রের কাছে জঙ্গল দেশে সবচেয়ে লাভজনক দ্রব্য ছিল নিমক। নিমক উৎপাদনের কর্তৃত্ব ছিল জমিদারদের, আর রাজকর স্বরূপে জমিদারদের কাছ থেকে নিমক জমা করতেন নবাবি দেওয়ানী বিভাগের ওয়াদাদাররা (superior revenue collectors)। একচেটিয়া ভাবে নিমক বিক্রয় করতেন দেওয়ানি নিমক আমলা-মহাজনেরা। কোম্পানির মহাশয়েরা সেই ব্যবস্থাকে জোর করে দখল করতে লাগলেন। নবাব মীর কাসিমের আমলে ঢাকার ফৌজদার মুহাম্মদ আলী বেগ ইংরেজদের বাণিজ্য ক্ষতিকর উদ্দেশ্যে কোম্পানি বিরুদ্ধ বারবার সামরিক অভিযান চালান।[৪৫] কয়েকজন জমিদার তাঁকে সাহায্য করেন, আর তাঁদের মধ্যে ছিলেন বাবুপুর রাজা রাজেন্দ্র চৌধুরী।[৪৬] মৌলিকের সম্পাদনের পাঠে প্রায় অর্দ্ধ শত বছর পরে রঙ্গমালার গীতিকা গঠিত হয়েছে। যদি এর সাহায্যে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করি, আমরা দেখতে পারি ইতিহাসের কত ঘটনা আঞ্চলিক লোক-স্মরণে (popular memory) টিকে আছে, আর কাল পরিবর্তনে কত বিস্মরণ ঘটেছে।

পূর্ববঙ্গে ইংরেজ কোম্পানি জমিজমা রাজস্ব আদায় করতে লাগল ১৭৬১ খ্রিষ্টাব্দে যখন হারী ফেরেল্স্ত (Harry Verelst) চট্টগ্রাম প্রদেশিক রাজস্ব সভার প্রধান (Chief of the Chittagong Council of Revenue) নিযুক্ত হন। তখন ঢাকায় ইরেজদের প্রধান ছিলেন জন কার্টিয়ের (John Cartier)। ১৭৬১ খ্রিষ্টাব্দে উভয় মহাশয় বায়না (advances) দিয়ে ব্যক্তিগত নিমক ও বস্ত্র-কাপর ব্যবসা চালান। তাঁদের ব্যবসা বাকেরগঞ্জ, সন্দীপ ও মেঘনার দুকূলের দেশেতে প্রসারিত হয়। কয়েক মাস ধরে যুগ্দিয়া (Jugdeah) বন্দরে উভয়ের নিমক বাণিজ্য উদ্ভাবিত প্রতিদ্বন্দ্বী হল, আর সেজন্য তাঁদের সঙ্গে গোমস্তাদের সঙ্ঘর্ষ হল।[৪৭] কোম্পানির মহাশয়দের একচেটিয়া বাণিজ্যের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দেশি বণিক ও জমিদারেরা নবাব মীর কাসিমকে অনেক নলিশ জানাল।[৪৮] বাবুপুরে কোম্পানির স্বপক্ষ ও বিপক্ষে চারজন ভূমিকা (roles) গ্রহণ করেন, ঢাকা ফৌজদার মুহাম্মদ আলী বেগ, কোম্পানির লক্ষ্মীপুর ফাক্তরি প্রধান ওয়িলিম্ বিল্লের্স (William Billers) আর বাবুপুর জমিদার চৌধুরী বংশে রাজা রাজেন্দ্র ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রাজচন্দ্র।

বিল্লের্সের চিঠিপত্র দাবী করে যে, তাঁর ভ্রাতৃ মরে গেলে রাজেন্দ্র বাবুপুর জমিদারি

অধিকার করে। নবাব মীর কাসিম আদেশ দেন যে, মৃত জমিদারের পুত্র স্বরূপে রাজচন্দ্রের জমিদারি-উত্তরাধিকার ন্যায়নিষ্ঠ, আর কিছু দিন ধরে তাকে রাজাসনে বসান। কিন্তু রাজেন্দ্র জোর করে তাকে অধিকারচ্যুত করেন। তারপর বিলের্স সাহেব রাজচন্দ্রকে বাবুপুর রাজ-সিংহাসনে বসাতে চেষ্টা করেন, কিন্তু রাজচন্দ্রের পক্ষে নবাবের আগেকার আদেশ হলেও মুহাম্মদ আলী বেগ রাজেন্দ্রকে জমিদারির অধিকার বজায় রাখতে সৈন্য প্রয়োগ করেন। বিল্লের্স দাবী করেন যে রাজেন্দ্র দেশের খ্যাতনামা ডাকাত ছিল, আর সব জমিদারদের উৎপীড়ন করে লুট করতেন।[৪৯] কিন্তু তাঁর দাবী সংশয়াপন্ন। তাঁর অন্য এক দলিল-পত্রতে জানা যায় যে, বাবুপুর পার্শ্ববর্তী দেশে কোম্পানি মহাশয়েরা তন্তুবায়দের বায়না দিয়ে নিজ ব্যবসায় প্রসারিত করতেন। বিল্লের্স সন্দেহজ্ঞাপন করেন যে, রাজেন্দ্র কোম্পানির বায়না মানেন না, তিনি কোম্পানি মহাশয়দের সব কাপড়-ব্যবসায় বাধা প্রদানসহ উৎপীড়ন করতে পারেন। বিল্লের্স চট্টগ্রাম রাজস্ব সভার প্রধান হারী ফেরেল্তকে কোম্পানি সিপাহিদের লেনদেন করার প্রার্থনায় চিঠি পাঠিয়ে দেন। তিনি সিপাহিদের পেয়ে বাবুপুর গড় আক্রমণ করে করেন এবং গড়টি গ্রহণ করেন। তারপর গড়টা রক্ষণ করতে সিপাহিদের নিযুক্ত করেন, ও আবার রাজচন্দ্রকে বাবুপুর আসনে বসান। তারপর মুহাম্মদ আলী বেগের সাহায্য পেয়ে, রাজেন্দ্র বাবুপুর গড়টা আবার গ্রহণ করেন আর এই লড়াইতে কয়েকজন কোম্পানির সিপাহিকে বধ করেন। ১৭৬২ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা ও লক্ষ্মীপুরে কোম্পানির সামরিক দুর্বলতার কারণে ইংরেজ মহাশয়েরা মুহাম্মদ আলী বেগ বিরোধে আর কিছু করতে পারেন না।[৫০] একবার রাজেন্দ্র ও রাজচন্দ্র যে লড়াই করেছিলেন তার লোক-স্মরণের ঐতিহাসিক উৎস ছিল মূলত ১৭৬২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁদের বাবুপুর গড় দখল করার বিপরীত মৈত্রীবন্ধন ও লড়াই।

বিল্লের্স কোম্পানির লাটসাহেব ভানসিত্তার্টকে (Vansittart) নিবেদন করেন যে, কোম্পানির স্বার্থে রাজেন্দ্রকে গ্রেফতার করা প্রয়োজন। কিন্তু মীর কাসিম বিরোধে সরাসরি যুদ্ধ বাধা দিতে লাটসাহব ভানসিত্তার্ট বিল্লের্সকে পরামর্শ দেন, যে তাঁর সব নালিশ মুহাম্মদ আলী বেগকে সম্পূর্ণ-ভাবে চিঠি লিখে পাঠিয়ে দেবেন।[৫১] তাতে নিশ্চয় কিছুই হল না। তারপর কয়েক মাস ধরে ঢাকা, লক্ষ্মীপুর, আর নোয়াখালি, আর সন্দ্বীপ, বামিনী, আর হাতিয়া দ্বীপে, মুহাম্মদ আলী বেগ বিরোধে কোম্পানি মহাশয়েরা সংগ্রাম করেন। মুহাম্মদ আলী বেগ তাঁর জমিদার ও আধীন সেনাপতিদের হুকুম দিলেন যে, কোম্পানির মহাশয়দের ব্যক্তিগত বাণিজ্যে রাজ কর না দিলে চলবে না, তাঁদের নিষ্কর বাণিজ্য অন্য বণিক-মহাজনদের পক্ষে ভারী অন্যায়।[৫২]

১৭৬২ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কোম্পানির লাটসাহেব হেনরি ভানসিত্তার্ৎ (Governor Henry Vansittart) আর ওয়ারেন হেস্তিংস (Warren Hastings) মুরশিদাবাদে যান, নবাবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তাঁদের দু-পক্ষের সবচেয়ে কলহমূলক তর্ক-বিতর্ক সমাধান করতে, যাতে উভয় পক্ষ অবাঞ্চিত যুদ্ধের দিকে অগ্রসর না হয়। আপোশ মতে যে ঐকমত্য মীর কাসিম ও ভানসিত্তার্ৎ রচনা করেন, তার সব চুক্তি প্রকাশ করেন নবাব মীর কাসিম। চুক্তিগুলো শুনে ঢাকা সভা (Dacca Council) গ্রাহ্য

প্রবন্ধকার ডেভিড এল. কুলী

না করে উত্তরে জানান যে, ইংরেজদের প্রজা স্বরূপ তাদের সারা জগতে তাঁদের অবাধ বাণিজ্যের অধিকার (as English subjects they had the right to free tradeworldwide) রয়েছে, আর তাঁরা সেই অধিকার সমর্পণ করতে সম্মত হবেন না। মুহাম্মদ আলী বেগ ফন্দি করেন, লক্ষ্মীপুর ইংরেজ কারখানা ঘিরে ফেলবেন, আর তাদের বাণিজ্যে বাধা দেবেন। অন্য জমিদারদের সঙ্গে বাবুপুর জমিদার রাজেন্দ্রকে সামরিক সাহায্য দিতে আজ্ঞা করেন। রজতকান্ত রায়ের মতে, নাববি উচ্চ কর্মকর্তা (officers) আর দেশি জমিদারদের তখনকার একমত ছিল, কোম্পানি বিরোধে স্বদেশভক্তি ও স্বদেশবাসীর

হিতসাধক অনুভূতিতে (a unity of patriotic sentiment)। কিন্তু তিনি উল্লেখ করেন না যে, রাজচন্দ্র ইংরেজ কোম্পানির মিত্র ছিল।[৫৩] ফেব্রুয়ারি মাসে ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে যুগিদিয়া, লক্ষ্মীপুর, আর জফরগঞ্জে ইংরেজদের সঙ্গে কয়েকটি ছোট সংঘর্ষ হয়।[৫৪]

১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে নবাবের সঙ্গে যে ঐকমত্য ভানসিত্তার্ৎ ও হেষ্টিংস প্রস্তাব করেছিলেন, কোম্পানির কলকাতা সভার (Calcutta Council) অধিজন তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন।[৫৫] তাঁদের আদেশ অনুসারে লাটসাহেব ভানসিত্তার্ৎ নবাব মীর কাসিমকে ভয় দেখান যে, তিনি যদি মুহাম্মদ আলী বেগকে উচিত শাস্তি না দেন তাহলে কলকাতা সভা দেশের আইন-কানুন উপেক্ষা করে তাঁকে শাস্তি-ব্যবস্থা করবে।[৫৬] পরবর্তী মাসে ঢাকার সভা স্বেচ্ছাক্রমে মুহাম্মদ আলী বেগকে ও তাঁর পাঁচজন আমলাদের গ্রেফতার করলেন।[৫৭] জুলাই মাসে নবাব বিরোধে কোম্পানির যুদ্ধ শুরু হয়। যখন ঢাকা শহর কোম্পানির ঢাকা সভার দখলে আসে তখন পূর্ববঙ্গে নবাবের শাসন প্রায় বিনাশ হয়ে যায়। সে সময়ে কোম্পানির চট্টগ্রাম সভা ত্রিপুরার সরকার ও সন্দ্বীপ পরগনার নবাবাত শাসন অধিকার করে।[৫৮] পূর্ববঙ্গে অবাধ একচেটিয়া বাণিজ্য পূর্ণারম্ভ হয়। অক্টোবর মাসে কোম্পানি দ্বারা বাছাই-করা নতুন নবাব মীর জাফর কলকাতা সভাকে নালিশ জানালে কোম্পানির মহাশয়েরা গোটা ত্রিপুরা ও সন্দ্বীপের জমাজমি দখল করে নেয়। কোম্পানির নতুন লাটসাহেব স্যার রবের্ত ক্লাইভ (Governor Sir Robert Clive) ও তাঁর নতুন রাজস্ব সমিতি (Board of Revenue) কোম্পানির মহাশয়দের আজ্ঞা করেন যে, এই দুটো দেশের জমাজমির আদায় নবাবি আমলাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।[৫৯]

কোম্পানি মীর কাসিমকে জয় করে। তৎসত্ত্বেও বাবুপুর জমিদার রাজেন্দ্র চৌধুরী কোম্পানির অধিকারে রাজী না হয়ে ক্যাপ্ট্যান গ্র্যাণ্ট (Captain Grant)-কে আজ্ঞা দিতে ঢাকা সভার লাটসাহেব ক্লাইভের কাছে আবেদন করেন যে,—তিনি যেন সিপাহিদের সঙ্গে রাজেন্দ্রকে বাবুপুর থেকে তাড়িয়ে দেন, এবং যদি সম্ভব হয় তাঁকে গ্রেফতার করেন।[৬০] ১৭৬৪ খিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে রাজেন্দ্র আত্ম-সমর্পণ করেন। কিন্তু বাবুপুর জমিদারি তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত তাঁর হাতে থাকে। তাঁর কোন পুত্র নেই বলে মৃত্যুর পর রাজেন্দ্রের উইল অনুসারে, একজন দৌহিত্র তাঁর জমিদারির চৌদ্দ-আনা আর রাজেন্দ্রের এক ভাগিনেয়ে জমিদারির দু-আনা অধিকার প্রাপ্ত হন। ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দুইজন ও তাঁর বংশধররা উত্তরাধিকারি থাকেন। কিন্তু রাজচন্দ্রের পুত্র কোম্পানির আদালতে নিজের অধিকার তুলে ধরে একটা মামলা এনেছিলেন, আর শেষে তার নিষ্পত্তি হয়। আদালতের রোয়দাদ অনুসারে রাজচন্দ্র ও তাঁর ছোট ভাইয়ের বংশধরদের মধ্যে জমিদারির সাত আনা ভাগ বণ্টন হয়, আর রাজেন্দ্রের দৌহিত্রের বংশধরদের চৌদ্দ আনা থেকে সাত আনা অধিকার কমানো হয়।[৬১]

কোম্পানির সমকালীন দলিল-পত্রতে বর্ণনা দেওয়া আছে যে, পূর্ববঙ্গে কোম্পানির বিরোধে ১৭৬২-১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে একটা বিস্তৃত ও সুপরিকল্পিত সংগ্রাম হয়। তার নেতা ছিলেন ঢাকার ফৌজদার মুহাম্মদ আলী বেগ। অন্য জমিদারদের সঙ্গে বাবুপুর জমিদার রাজেন্দ্র চৌধুরী তাঁকে সাহায্য করেন। সংগ্রামটার উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানির মহাশয়দের

একচেটিয়া নিমক বাণিজ্য নিশ্চল করা, জোর করে বায়না দিয়ে বস্ত্র উৎপাদন ও বাণিজ্য, ও তাঁদের রাজ কর-মুক্ত ব্যবসা নিশ্চিত করা।

"রঙ্গমালা সুন্দরী বা চোধুরী লড়াই" শীর্ষক গীতিকার উভয় সম্পাদনে লোক-স্মরণ দিয়ে রচনা হলেও বাবুপুরের দুই চৌধুরীর লড়াই বড় এক রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিবেষ্টিত ছিল, তা অনেকটা বিস্মৃত। তাতে মুহাম্মদ আলী বেগের কোল উল্লেখ নেই। কিন্তু গীতিকাটির যে কোন ঐতিহাসিক সত্য নেই, তাও নয়।

রাজেন্দ্র ও রাজচন্দ্র ছিলেন ইতিহাসের সুচেনা লোক। কোম্পানির দলিল-পত্র ও গীতিকাটিতে বর্ণিত আছে যে, রাজেন্দ্র ও তাঁর বড় ভাইর পুত্র রাজচন্দ্র বাবুপুর জমিদারের অধিকার নিয়ে বিতর্ক ও কলহ করেন। কোম্পানির দলিল-পত্রে বিল্লের্স মহাশয় রাজচন্দ্রকে সাহায্য করেন। গীতিকাটিতে রাজচন্দ্র ইংরেজির মত "ইঙ্গা" নামে এক ব্যক্তির কাছ থেকে সাহায্য পাবার চেষ্টা করেন, আর তার ফলে ইঙ্গার সঙ্গে রাজচন্দ্রের শর্ত করার একটি উপকথা যুক্ত হয়। ইঙ্গার সাহায্য পেয়ে রাজচন্দ্র যে কিছু দিন ধরে জমিদারির বা তার অর্ধ-অংশের অধিকারী হন, তাতেও দলিল-পত্র ও গীতিকাটির মধ্যে সাক্ষ্য আছে।

তাহলেও, গীতিকাটির গৌণ চরিত্রদের মধ্যে লোক-গীত ও রূপকথার আদর্শ বা ছাঁচ অনুসারে অনেক বানানো কাহিনী আছে, যেমন—রাজেন্দ্রের বীর চাঁদভাঁড়ালী ও রাজচন্দ্রের বীর রামভাঁড়ালী। গায়েনরা সম্ভবত রূপকথা থেকে চাঁদভাঁড়ালীর অত্যুক্তিকর বীরত্ব ও ইঙ্গার গড়ের উপরে তাঁর একার আক্রমণের গড়ন গ্রহণ করেন। রামভাঁড়ালীর চরিত্রও একই রকম, এবং তাঁর বাবুপুর প্রজাদের উৎপীড়নের উপকথাগুলি রূপকথার ছাঁচ মাত্র। কিন্তু তাতেও ঐতিহাসিক বাস্তবতার একটা সত্য আছে, অষ্টাদশ শতবর্ষে জমিদাররা জোর করে প্রজাদের শাসন করেন। তেমন করে বানানো চরিত্র হয় মগদের নেতা ও সেনাপতি "রাম্যা মগ"। রাজচন্দ্র তাকে আদেশ করেন যে, রঙ্গমালার নর পরিবারের জন্যে তার মগরা একটা বিরাট দিঘি খনন করবে ও রাম্যা নিজে রঙ্গমালাকে রক্ষণ করবেন। চাঁদভাঁড়ালী তার সঙ্গে কয়েক প্রহর ধরে অত্যুক্তিকর সংগ্রাম করেন, এবং শেষে তাকে বধ করেন। তাতেও দু-একটা ঐতিহাসিক সত্য আছে। উনিশ শতকে চট্টগ্রাম প্রদেশে মগরা জুম আবাদ করত, আর পরে মজুরের দলে খাটল, এবং অষ্টাদশ শতকে তারা খ্যাতনামা নৌ-সৈনিক ছিল।[৬২]

উপসংহার: রঙ্গমালার দুটো চরিত্র

রঙ্গমালা কি একজন ঐতিহাসিক নারী? ইংরেজি দলিল-পত্রে আমি তার কোন সাক্ষ্য দেখি নি। কিন্তু তাঁর যে ঐতিহাসিকতা একদম অসম্ভব, তাও বলা যায় না। কালক্রমে গীতিকার যে রকম পরিবর্তন হত তা সাধারণত মূল-গল্পে নয়, বরং মূল-গল্পের আগে ও পরে সংযুক্ত উপকথাগুলোতে ঘটত। এ রকম উপকথার উদ্দেশ্য ছিল মূলগল্পটি বোধগম্য করা, আরও বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার মধ্যমে তার কারণ ও পরিণতিকে পূর্ণতাদেওয়া হত। বাবুপুর চৌধুরীদের মত রঙ্গমালা মূলগল্পের চরিত্র। রঙ্গমালা নীচ জাতির একজন

বাস্তব নারী। কিন্তু আমাদের দলিল-পত্রে এর কোন সাক্ষ্য নেই বলে রঙ্গমালা বাস্তবে কে ছিলেন? সে প্রশ্ন উত্তর দিতে পারব না। তবে, আমরা উপসংহার স্বরূপ গীতিকাটির সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ স্পষ্ট করে দেখাতে রঙ্গমালার চরিত্র বিষয়ে আরও বিশ্লেষণ এবং সমালোচনা করতে পারি।

মৌলিক ও সেনের দুটো সম্পাদনাতে রঙ্গমালার চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য ও গুণ আছে—তাও নিশ্চিত; আবার দুটো চরিত্র বিপরীত, আর লোক-গীত ও রূপকথার নীচ নারীদের ছাঁচ অনুসারে উভয় চরিত্র গঠিত হয়েছে। মৌলিকের সম্পাদনাতে রঙ্গমালার প্রেম ছিল সত্য ও স্বার্থপরতাশূন্য। গীতিকাটি যখন সেনের রূপে গঠিত হয় তখন রঙ্গমালার চরিত্র মোটামুটি স্বার্থসম্পন্ন ও অবিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। শ্রাবকদের রসের জন্যে আর তাদের অনুভূতি ও মত (sentiments and opinions) অনুসারে উভয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য গঠিত হয়েছে। লোকদের অনুভূতি ও মত যেমন বদলে যায়, তেমনি প্রশ্ন আসে যে, শূদ্র জমিদার কুলের ছেলে রাজচন্দ্র কি রঙ্গমালার সঙ্গে বিবাহ করতে পারে? আমরা দেখেছি যে, মৌলিকের সম্পাদনাতে চাঁদভাঁড়ালীর মতে বিবাহটি একদম অসম্ভব ছিল, কিন্তু রাজেন্দ্রের মতে তা অসম্ভব ছিল না। মৌলিকের সম্পাদনাতে রঙ্গমালা ও রাজচন্দ্রের অভীষ্ট লক্ষ্য রঙ্গমালার মরণ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।

মৌলিকের গীতিকার খুব ভালো কয়েকটি চরণ হল: (রঙ্গমালা যা রাজচন্দ্রের কাছে গেয়েছিল)

পিরিতি পিরিতি সবাই করে
জানেনা পিরিত কাণ্টার মালা॥
সখী, পিরিতি বিষম জ্বালা
বনে থাকে বনর ফুল রে
দেইখতে লাগে ভালা।
মনের বনে পিরিত ফুল
বাইরে আইনলে কালা-রে॥
সখী, পিরিতি বিষম জ্বালা[৬৩]

রঙ্গমালার আশা ছিল যে, রাজচন্দ্র তাঁর প্রেম গুপ্ত রাখবেন, তাতে নরদের রক্ষণ হবে। কিন্তু রাজচন্দ্রের ব্যক্তিগত মান, অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্যের কারণে রঙ্গমালার সেই আশা বিপরীত হল।

রঙ্গমালার বিলাপ গানের ঠিক আগে রাজচন্দ্র ধর্মের নামে শপথ নিয়ে বলেছিলেন:

গলাৎ পরি আইছি আমি এইনা মোতির মালা।
তোমার গলাৎ দিতাম চাই এইনা রাইতর বেলা॥
ধর্ম সাক্ষী করি আমি তোমারে মালা পরাব।

জীবনে মরণে আমি তোমারে ন ছাড়িব॥
রাজ রাজত্তি যায় যাউক যাউক কুল মান।
কিছু ন গনিব আমি তোমার সোমান॥[৬৪]

এমন শপথের মাধ্যমে রাজচন্দ্র যে সত্য প্রকাশ ও প্রমাণ করে আর তা প্রমাণের জন্য প্রকাশ্যে বিবাহের প্রয়োজন পড়ে। না হলে সে তার রাজা-যোগ্য মান-সম্ভ্রম হারাবে। সে-জন্যে রাজচন্দ্র নরদের বিরাট দিঘি খনন করতে আজ্ঞা দেয়, আর তাতে জল তোলার উৎসব ও ভোজনের ব্যবস্থা করে, আর নিমন্ত্রণপত্র লিখে রাজেন্দ্রকে পাঠায়। তার উদ্দেশ্য ছিল যে, সর্বজন হাজির হয়ে রঙ্গমালা ও তার নর পরিবারের জাতি উচ্চতর করবে।

মৌলিকের গীতিকাতে যখন চাঁদভাঁড়ালী রঙ্গমালা ও নর পরিবারদের বধ করল, তখন তার "কালা" পিরিত ফুল প্রকাশ পায়। রাজচন্দ্র রাজেন্দ্রকে ভোজনে নিমন্ত্রণ দিতে গেলে, বীর চাঁদভাঁড়ালীর হাতে রঙ্গমালার যে মরণ হবে, তাই সে আগেই স্পষ্ট করে জানিয়ে ছিল, এভাবে:

দেয়ান আছিল ইঙ্গা চৌধ্রী বহুত লস্কর তার।
একরাইতে চাঁদভাঁড়ালী করি দিল ছারখার॥
দারুণ রাজিন্দর খুড়ার হুকুম যদি পাইব।
নর বংশর মুণ্ড লই গুলি্ত খেলাইব॥
শুনেন শুনেন মহারাজ পায়ৎ ধরি কই।
এই পত্র ন পাঠাইবেন আমার মুখ চাই॥[৬৫]

মৌলিকের সম্পাদনার পাঠে গীতিকাটি ব্যক্ত করে দেখায় নীচ নারী যদি উচ্চ পুরুষের প্রেমের দরুন জাতির নিয়ম লঙ্ঘন করে আর সে প্রেম গুপ্ত রাখতে না পারে তাহলে বিপদগ্রস্ত হয়ে নারীকে তার জীবন দিতে হবে। যেন বনের সুন্দর গুপ্ত ফুল তার প্রেম নির্জন স্থানে আশ্রয় করার দরকার। কিন্তু উচ্চ পুরুষ-মানুষের অবস্থা বিপরীত। তাঁকে নারীর প্রতি প্রেমের যে যে সত্য-শপথ করেন, তাদের সত্যতা প্রমাণ দিতে হয়। প্রমাণ করার গতিপথে, তাঁর প্রেম সর্বজনে প্রকাশ করতে হয়, না হলে তাঁর মান-সম্ভ্রম হানি হবে। নীচ নারী ও উচ্চ পুরুষের অবস্থার মধ্যে এই বিরোধিতা সম্ভাবনা ছিল যখন শূদ্র রাজা নীচ নারীকে বিবাহ গ্রাহ্য হওয়া একদম অসম্ভব ছিল না। উপপত্নীকে স্ত্রীস্বরূপ সর্বজনে আস্তে আস্তে গ্রাহ্য করতে পারে যদি তার প্রতি রাজার স্নেহ থাকে এবং উপপত্নী নারীটি আচার-আচরণে ও ভালো চরিত্রের অধিকারী হয়।[৬৬] সে দুর্লভ ফলের বীজ প্রেমের সূচনাতেই ছিল, যদিও সে-প্রেম জাতি-ধর্ম লঙ্ঘন করে। মৌলিকের পাঠে গীতিকাটি সেই অবস্থা ইঙ্গিত করে। যে অবস্থা উনিশ শতকের শেষে অতিবাহিত হয় তাকে ব্যক্ত করে গীতিকাটি সেনের পরবর্তী পাঠে। তাতেও গীতিকাটির ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১. This essay is an abridged translation, with some revisions, of my essay, 'Ballads, Public Memory, and History in the Littoral Zone of Eastern Bengal', in Raziuddin Aquil and David L. Curley (eds), *Literary and Religious Practices in Medieval and Early Modern India* (Delhi, 2016).

২. দীনেশচন্দ্র সেন, *পূর্ববঙ্গ গীতিকা*, ৪ খণ্ড (কলকাতা, ১৯২৩-১৯৩২); Dinesh Chandra Sen (ed. and trans.), *Eastern Bengal Ballads*, 4 vols. (Calcutta, 1923-1931);ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক (সম্পাদক), *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা*, ৭ খণ্ড (কলকাতা, ১৯৭০-১৯৭৫).

৩. Dipesh Chakravarty, 'Romantic Archives: Literature and the Politics of Identity in Bengal', *Critical Inquiry* 30 (2004): 654-82.

৪. ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক, *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* ১: ভূমিকা, পৃ. ১০-১১.

৫. Rila Mukherjee, Strange Riches: *Bengal in the Mercantile Map of South Asia* (New Delhi, 2006), pp. 27-35.

৬. Sen, *Eastern Bengal Ballads* 4: 128, 148.

৭. Ibid, 2: 138-88.

৮. Ibid,3: 64-106.

৯. Adriana Duque, 'Sex and the Border: Byzantine Epics and the Spanish Frontier Ballad', *The Medieval History Journal* 14, 2 (2011): 213-28.

১০. Rajat Kanta Ray, *The Felt Community: Commonality and Mentality before the Emergence of Indian Nationalism* (New Delhi, 2003), pp. 283-6, 289-90.

১১. পাঁচ লেখক ও বইয়ের নাম: বছনিয়া সেখ, সারগীতি; ইয়াখুব সাহেব, রঙ্গসুন্দরী; ইয়ুনুছ মিঞা, রঙ্গমালার কেচ্ছা: আরসাদ আলী, রঙ্গমালার দিঘি; আফছার উদ্দিন, পিরিতের দিঘি। দেখবেন মৌলিক, *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* ৪: ভূমিকা, পৃ. ৭-৮.

১২. ঐ.

১৩. রাজচন্দ্রের বাবার নাম বাবুচাঁদ উল্লেখ করা হয় (মৌলিক, *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* ৪: ১৪৯), কিন্তু আসলে তাঁর নাম প্রতাপনারায়ণ. কোম্পানি নতি-পত্র ও চৌধুরী রাজবংশাবলিদেখবেন: W.H. Thompson, *Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Noakhali 1914-1919* (Kolkata, 1919), p. 74; Sen, *Eastern Bengal Ballads* 3: 233.

১৪. James Wise, *Notes on the Races, Castes and Tribes of Eastern Bengal* (London,1883), p.351; শাহীন আখতার, *সখী রঙ্গমালা* (ঢাকা, ২০১০), পৃ.১২১, ১৩২; মৌলিক, *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* ৪: ১১২.

১৫. মৌলিক, *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* ৪: ১৯-২৮; Sen,*Eastern Bengal Ballads*3: 265-69.

১৬. ঐ, পৃ. ২৯-৪২; Sen, *Eastern Bengal Ballads* 3: 269-74.

১৭. ঐ, পৃ. ২৫-২৮; compare Sen, *Eastern Bengal Ballads* 3: 268-9.

১৮. ঐ, পৃ. ২৮, ১৭৬; Sen, *Eastern Bengal Ballads* 3: 269, but Sen does not includeMoulik's final story that Ramchandra arranged Rangamala's cremation, and that his strongman (exi) forced a Brahman to attend and recite its mantras.

১৯. ঐ,পৃ. ৪৩-৫৪; Sen, pp. 239-44; In his version of this sub-story Sen does not include the declaration about Rangamala's new knowledge of who were "her own" people and who were "others". Inboth versions Rangamala drives the groom away by kicking him.

২০. ঐ, পৃ. ১১১.

২১. ঐ, পৃ. ১১২-১৩.

২২. David L. Curley, 'The "World of the Text" and Political Thought in Bengali Mangal-kāvya, c. 1500-1750', *The Medieval History Journal* 14,2(2011): 183-211.

২৩. মৌলিক, *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* ৪:১১৮, ১২৩.

২৪. Sen, *Eastern Bengal Ballads* 3:262, 275-77.

২৫. Ibid, p. 279, plate, 'Rangamala's Pond'; p. 239, 'Relics of a fort near Rajendra Narayan Choudhuri's palace in Babupur'. The photographer and ballad collector was Mr. Asutosh Choudhuri (Ibid, 'General Introduction', p. 72).

২৬. মৌলিক, *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* ৪: ১৪০-১.

২৭. ঐ, পৃ. ১৪৮-৯.

২৮. ঐ, পৃ. ১৬০.

২৯. ঐ, পৃ. ১৬০.

৩০. ঐ, পৃ. ১৬৩-৮.

৩১. ঐ, পৃ. ১৭০-১.

৩২. ঐ, পৃ. ১৭৪, পাদটিকা; পৃ. ১৭৫-৭. তুলনা করবেন শাহীন আখতার, *সখী রঙ্গমালা*, পৃ. ১২১, ১৩২;Wise, Notes on the Races, Castes and Tribes, p. 351. Wise spells their jati name নড়, but in Moulk it is bi.

৩৩. মৌলিক, *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* ৪: ১৭৭-৮.

৩৪. ঐ, পৃ. ১৮৪.

৩৫. ঐ, পৃ. ১৮৬.

৩৬. মৌলিক, *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* ৪: ১৮৮; ও পদটীকা ১০.

৩৭. ঐ, পৃ. ১৮৯.

৩৮. ঐ, পৃ. ১৮৯-৯২.

৩৯. ঐ, পৃ. ১৯২-৩.

৪০. ঐ, পৃ. ১৯৩.

৪১. ঐ, পৃ. ১২৩.

৪২. Sen, *Eastern Bengal Ballads* 3: 262, 276.

৪৩. Indrani Chatterjee, *Gender, Slavery and Law in Colonial India* (Delhi, 2002), pp. 78-124, 225-34.

৪৪. Sen, 3: 287-94, 303-8.

৪৫. Rajat Kanta Ray, *The Felt Community: Commonality and Mentality before the Emergence of Indian Nationalism* (New Delhi, 2003), pp. 227-301; P.J. Marshall, *The New Cambridge History of India* II.2, *Bengal: The British Bridgehead* (Cambridge, 1987), pp. 84-88; Abdul Majed Khan, *The Transition in Bengal, 1756-1775: A Study of Saiyid Muhammad Reza Khan* (Cambridge, 1969), pp. 32-48.

৪৬. Ray, *Felt Communtity,* pp. 284-7.

৪৭. British Library, Eur. Mss., Verelst papers, F218/70, folio 89b, Verelst to Cartier, 16 Dec. 1761; folio 92, Verelst to Cartier, 30 Dec. 1761; folio 93b, Verelst to Cartier, 5 Jan. 1762; folio 94, Verelst to John Ashwood Porter, 16 Jan. 1762; folio 106, Verelst to Vansittart, 11 May 1762.

৪৮. Henry Vansittart (ed.), *Original Papers Relative to the Disturbances in Bengal, containing every material transaction from 1759 to 1764,* 2 vols. (London, 1765) 1: 200-3, translation of a letter from the Nawab to Governor Vansittart, received April 1762, with enclosures; pp. 198-200, translation of a letter from the Nawab to Governor Vansittart, received May, 1762.

৪৯. Sirajul Islam (ed.), *Bangladesh District Records, Chittagong,* Vol. 1, 1760-1787 (Dhaka, 1978), pp. 94-5, Billers to Vansittart, 1 July 1762.

৫০. Henry Vansittart (ed.), *Original Papers* 1: 205-7, Translation of a letter from Muhammad Ali to Governor Vansittart, received October 1762; Islam (ed.), *Bangladesh District Records, Chittagong,* Vol. 1,pp. 95-6, Billers to Governor Vansittart, 17 July 1762.

৫১. Islam (ed.), *Bangladesh District Records, Chittagong* 1: 96-8, Billers to Vansittart, 14 October 1762; p. 98, Billers to Vansittart, 10 January 1763.

৫২. Ibid. pp. 96-8, Billers to Vansittart, 14 October 1762; Vansittart (ed.), Original Papers 2: 210-11, Extract of a letter from the Chief and Council at Chittagong to the Governor and Council, 14 October 1762; and p. 211, Extract of a letter from the Chief and Council at Dacca to the Governor and Council, 8 October 1762.

৫৩. Ray, *Felt Community, pp. 284-7; Henry Vansittart, A Narrative of the Transactions in Bengal, from the Year 1760, to the Year 1764, under the Government of Mr. Henry Vansittart,* 3 vols. (London, 1766), 3: 137-9, letter from Muhammad Ali Beg to Saiyid Buddul Khan.

৫৪. Vansittart, Narrative 2: 310-14, letter from the Luckypore Council to Governor Vansittart and Council, 16 February 1763; 3: 15-20, letter from the NawabMir Qasim to Governor Vansittart, describing the same events.

৫৫. Ibid 2: 316-420, extract of the Calcutta CouncilÕs consultations of 1 March 1763.

৫৬. India, Imperial Records Department, *Calendar of Persian Correspondence, being Letters, referring mainly to Affairs in Bengal, which passed between some of the CompanyÕs Servants, and Indian Rulers and Notables,*11 vols. (Calcutta, 1911-25), 1: no. 1722, dated 1 April 1763, letter from Governor Vansittart to Nawab Mir Qasim.

৫৭. Ibid, no. 1755, letter from Muhammad Salih to Muhammad Ali Beg, dated 29 April 1763; and no. 1756, from Nawab Mir Qasim to Vansittart, dated 20 April 1763.

৫৮. Khan, *Transition in Bengal,* pp. 53-4.

৫৯. British Library, India Office Records, Bengal Public Consultations, P/1/36, consultations 10 October 1763, letter from Nawab Mir Jafar; Khan, *Transition in Bengal,* pp. 54-5.

৬০. Khan, *Transition in Bengal,* p. 54; James Long, *Selections from Unpublished Records of Government,* 2nd ed., Mahaprasad Saha editor (Kolkata 1973), no. 798, letter from Dacca, dated 10 January 1764, p. 403.

৬১. W.H. Thompson, *Final Report,* pp. 74-5.

৬২. Willem van Schendel (ed.), *Francis Buchanan in Southeast Bengal (1798)* (Delhi, 1992), pp. 20, 28;Gargi Chattopadhyay, 'A Study of Three Locations along the Hugli from the late sixteenth to the early nineteenth century: Kasimbazar, Hooghly, and Sagor' (Jadavpur University Ph.D. thesis, 2017), pp. 358-73; Jamini Mohan Ghosh, *Magh Raiders in Bengal* (Calcutta, 1960).

৬৩. মৌলিক, *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* ৪: ১২৩, ধুয়া.

৬৪. ঐ, পৃ. ১২২-৩; তুলনা করবেন, পৃ. ১১৮, শ্যামপ্রিয়াকে রাজচন্দ্রের বাচন।

৬৫. ঐ, পৃ. ১৭৮.

৬৬. Chatterjee, *Gender, Slavery and Law,* pp. 225-6.